ইসলামী সাহিত্যচর্চায় মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) এর অবদান: একটি পর্যালোচনা

এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত গবেষণাপত্র

তত্ত্বাবধায়ক:

ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক:

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
শিক্ষাবর্ষ-২০১৫-২০১৬
রেজিস্ট্রেশন নং-১৮৮/২০১৫-১৬
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত গবেষণাপত্র-২০২০

সূচীপত্রঃ

ক্রমিক নং	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১		প্রত্যয়ন পত্র	**০৩**
০২		ঘোষণা পত্র	**০৪**
০৩		সংকেত সূচী	**০৫**
০৪		ভূমিকা	**০৬**
০৫	প্রথম অধ্যায়	মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমীর সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ	**০৯**
০৬	দ্বিতীয় অধ্যায়	মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) এর জীবন ও কর্ম	**১৬**
০৭	তৃতীয় অধ্যায়	আক্বীদা সংক্রান্ত ইসলামী সাহিত্যচর্চা	**৩৮**
০৮	চতুর্থ অধ্যায়	অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় ইসলামী সাহিত্যচর্চা	**৫৬**
০৯		মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) রচিত গ্রন্থাবলীর বিষয় ভিত্তিক শ্রেণি বিন্যাস	**৮৯**
১০		উপসংহার	**৯২**
১১		গ্রন্থ পঞ্জী (Bibliography)	**৯৪**

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬২৯০-৬২৯১
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৭২২২

Department of Islamic Studies
University of Dhaka
Phone : 9661920-73/6290-6291
Fax : 880-2-9667222

সূত্রঃ তারিখঃ

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, শিক্ষাবর্ষ-২০১৫-২০১৬, রেজিস্ট্রেশন নং-১৮৮/২০১৫-১৬, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত “ইসলামী সাহিত্যচর্চায় মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) এর অবদান: একটি পর্যালোচনা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোন যুগ্ম গবেষণা নয়; বরং গবেষকের নিজের মৌলিক গবেষণাকর্ম। ইতঃপূর্বে এ শিরোনামে এম. ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

আমি অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আগাগোড়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ পরিমার্জন করেছি। এর মৌলিকত্ব বিচার করে আমি গবেষককে এম. ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট এটি উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্রঃ

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামী সাহিত্যচর্চায় মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) এর অবদানঃ একটি পর্যালোচনা" শিরোনামে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ কোন যৌথ প্রয়াস নয়। এটি আমার একক গবেষণাকর্ম। এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ থিসিস-এর অংশ বিশেষ অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন প্রতিষ্ঠানে কোনপ্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

আপনার বিশ্বস্ত

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
শিক্ষাবর্ষ-২০১৫-২০১৬
রেজিস্ট্রেশন নং-১৮৮/২০১৫-১৬
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচীঃ

আ. : আলাইহিস সালাম
সা. : সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা. : রাদ্বিয়াল্লাহু তায়া’লা আনহু
র.আ. : রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
মু.জি.আ. : মুদ্দা জিল্লুহুল আলী
কু.সি : কুদ্দিসা সিররুহু
ড. : ডক্টর
হি. : হিজরী
খ্রি. : খ্রিষ্টাব্দ
তা.বি : তারিখ বিহীন
পৃ.নং : পৃষ্ঠা নম্বর
লে. : লেফট্যানেন্ট
ইফাবা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
p.n : page number

ভূমিকা:

জ্ঞান মানুষকে অমরত্ব দেয়। তাই “পড়ুন আপনার প্রভূর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন!” এই মহাবাণী দিয়ে পবিত্র ওহীর সূচনা। ইসলাম জ্ঞান চর্চার ধর্ম। পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ ইসলামী জ্ঞানের প্রধান উৎস। ঐশী বাণী হওয়াতে এ দু’টি সংক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপক অর্থবহ ও তাৎপর্যময়। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানবানগণই এটা উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। এ দু’টির বোধ শক্তিও আল্লাহ প্রদত্ত মহাদান। যাঁরাই এই মহাদানে ধনী হতে পেরেছেন তাঁরাই ইহ ও পর জগতে পরম কল্যাণের ধারক হয়েছেন। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘‘আল্লাহ যদি কোন বান্দার কল্যাণ চান, তাহলে তাকে দ্বীনের (কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী শরী‘আতের) বোধ শক্তি দান করেন”। আর এ জাতীয় আলিমগণকে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উত্তরাধিকারী বলেছেন। সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন হতে শুরু করে অদ্যাবধি অনেক নাবীর উত্তরাধিকারী আলিম ইসলামের সঠিক আকীদা-আমলের ধারাকে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত ‘সিরাতে মুস্তাক্বীম’-এর উপর অক্ষুন্ন রাখতে এবং বিধর্মী-বাতিল ফিরকার (দলের) ছোবল থেকে রক্ষা করতে জ্ঞানের নানা শাখায় সংস্কারক, মুতাকাল্লিম, মুজতাহিদ, ফক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, সূফী, দার্শনিক হিসেবে নানাবিধ বিষয়ে অবদান রেখে জগতে অমর হয়ে আছেন। ইসলামী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ভারতীয় উপমহাদেশে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরব বণিক সাহাবা-তাবিঈ-ওলী-ওলামার নেতৃত্বে ইসলাম আগমন করে। পৌত্তলিকতার দূর্গে ঘন্টা-কাসাঁ ধ্বনির স্থলে সুমধুর আযান ধ্বনিত হয়। পৌত্তলিক সংস্কৃতির উপর ইসলামী আরবীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। সেই থেকে শতাব্দী কাল ধরে ওয়ালী-ওলামার অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর আত্মত্যাগ, সুযোগ্য নেতৃত্ব, ক্ষুরধার লেখনী ও তথ্যমূলক শিক্ষা-উপদেশ (ওয়াজ) এতদ্‌ অঞ্চলের মুসলমানগণকে ইসলামের নির্ভেজাল পথ ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আত’-এর সুশীতল ছায়াতলে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছে। এই উপমহাদেশে ইসলাম আগমন হতে শুরু করে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত একধারার ইসলামী শরীয়ী‘ রীতি-নীতি ও বিধিবিধান প্রচলিত ছিল। এদেশের মুসলিম সমাজে ‘নজদী-ওহাবী’, ‘ওরিয়েন্টাল ইসলাম’ ও ‘খতমে নবুয়ত বিরুদ্ধ’ আক্বীদার অনুপ্রবেশ ঘটে; যা ইসলামী আক্বীদার মূলধারা ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত’-এর ঐতিহ্যবাহী মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের মাঝে দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। এধরণের দ্বন্দ্ব নিরসনে যুগে যুগে বহু মনীষী এগিয়ে আসেন। ইতঃপূর্বে বিশেষত, ইসলামী সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন– হিন্দাল ওলী খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশ্‌তী সানজারী আজমিরী (৫৩৬হি./১১৪১খ্রি.-৬৩৩হি./১২৩৬খ্রি.), মুজাদ্দিদ-এ আলফ সানী শাইখ আহমদ সিরহিন্দী ফারুক্বী (৯৭১হি./১৫৬৩খ্রি.-১০৩৪হি./১৬২৪খ্রি.), শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (৯৮৫হি./১৫৫১খ্রি.-১০৫২হি./১৬৪২খ্রি.), শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪হি./১৭০৩খ্রি.-১১৮৪হি./১৭৬২খ্রি.) ও শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১৫৭হি./১৭৪৬খ্রি.-১২৩৯হি./১৮২৪খ্রি.) প্রমূখ ইসলামী সূফী-ওয়ালী-আলিমগণ। ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত’-এর উপর যখন ত্রিমূখী আক্রমণ আঘাত হানে তখন আ‘লা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (১২৭২হি./১৮৫৬খ্রি.-১৩৪০হি/১৯২১খ্রি.), মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী (১৩০০হি./১৮৮২খ্রি.-১৩৬৭হি./১৯৪৯খ্রি.), সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (১৩০০হি./১৮৮২খ্রি.-১৩৬৭হি./১৯৪৮খ্রি.) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন প্রমূখ বিদগ্ধ পন্ডিত-আলিম-সূফীগণ তাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলে সঠিক মতাদর্শ প্রচারে ব্রতী হন। তাঁদের ধারাবাহিকতায় যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান; বিশেষ করে আক্বাঈদ শাস্ত্রে অনন্য অবদান রেখে গেছেন হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী বাদায়ূনী আশরাফী ক্বাদিরী (র.আ.) (১৩১৪হি.-১৮৯৪খ্রি/১৩৯১হি.-১৯৭১খ্রি.)।

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) এমন একজন ইসলামী বিদগ্ধ পন্ডিত ও ধী-ধারী আলিম ছিলেন যাঁকে নিয়ে পুরো মুসলিম মিল্লাত গর্ব করেন। যিনি ছিলেন সত্যিকারের নাবী উত্তরসূরী, প্রাজ্ঞ নেতা এবং উত্তম ফয়সালাদানকারী। তিনি একাধারে মুতাকাল্লিম, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, বিতার্কিক, কবি, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, পরিব্রাজক, লেখক, গবেষক, সুবক্তা, সমাজসংস্কারক, ইমাম, পীর, সূফী ও বিচারক ছিলেন। বহুপ্রতিভাধর ক্ষণজন্মা এই ব্যক্তি ইমাম-এ আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদ-এ দ্বীন ও মিল্লাত আ'লা হযরত ইমাম হাফিয শাহ আহমদ রেযা খান বেরেলভী ক্বাদিরী (র.আ.)-এর ক্ষুরধার জ্ঞানদীপ্ত, গভীর বিশ্লেষণমূলক লেখনীর দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর আক্বীদাসমূহকে কুরআন-হাদীছের আলোকে সহজ-সাবলীল সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় তুলে ধরেছেন। আ'লা হযরতের লেখাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল আলিম ও জ্ঞানী সমাজকে জাগিয়ে তোলা, বুঝানো। সাধারণ মানুষের জন্য সেগুলো অনুধাবন করা একটু কঠিনই ছিল। তাই তাঁর পর আরেকজন কলম সম্রাটের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলো 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'। যিনি আহলে সুন্নাতের আক্বীদাগুলোকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তুলে ধরবেন। আর সেই কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.)। তিনি তদ্‌সঙ্গে সমকালীন আরো নানাবিদ সমস্যার সাবলীল-বোধগম্য-সরল ভাষায় উত্তর প্রদান করে অর্জন করেন 'মুফতী-এ ইসলাম'-এর লক্বব। মুসলিম জাতির প্রত্যাশা পূরণ করে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন 'হাকীমুল উম্মাত'-এর সুউচ্চ আসনে। আর 'মসলক-এ আ'লা হযরত' তথা আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরেলভী (র.আ.)-এর উচ্চাঙ্গিক লেখনী-চিন্তাধারা সমূহকে সহজ-সরল উর্দূ ভাষায় লিখে সাধারণ বোধগম্য করার কারণে বিদগ্ধ জ্ঞানী সমাজ তাঁকে 'তারজুমান-এ আ'লা হযরত' তথা 'আ'ল হযরত ভাষ্যকার' উপাধীতেও অলংকৃত করেছেন।

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর সঠিক আক্বীদা প্রচার, প্রকাশ ও প্রসারে বিশ্লেষণধর্মী দার্শনিক তত্ত্ব ও শরয়ী' তথ্য সমৃদ্ধ লেখনির মাধ্যমে তিনি যে খিদমাত করে গেছেন এবং যে অমূল্য রচনাবলী রেখে গেছেন এর সঠিক ও যথার্থ মূল্যায়ন আজো হয়নি। এ অভাব পূরণের মানসেই আমি **"ইসলামী সাহিত্যচর্চায় মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) এর অবদানঃ একটি পর্যালোচনা"** শিরোনামে গবেষণা করার বিষয়ে আগ্রহী হচ্ছি। বর্তমানে এতদ্ অঞ্চলের চাহিদানুযায়ী অত্র গবেষণা কর্মটি মাতৃভাষা বাংলায় একটি ভূমিকা, চারটি অধ্যায় যথাক্রমে- প্রথম অধ্যায়: মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী'র সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.)-এর জীবন ও কর্ম। তৃতীয় অধ্যায়ঃ আক্বীদা সংক্রান্ত ইসলামী সাহিত্যচর্চা। চতূর্থ অধ্যায়ঃ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় ইসলামী সাহিত্যচর্চা। অধ্যায় সমূহের আলোচনার শেষে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) রচিত গ্রন্থাবলীর বিষয়ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস রচনা করেছি। শেষে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জী উল্লেখ করে গবেষণাপত্রের ইতি টেনেছি।

এবিষয়ে সামগ্রিক পরিকল্পিত গবেষণা ইতঃপূর্বে তেমন হয়নি। ফলে এই গবষেণা কর্মে আমাকে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরি, গুণীজনদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারসহ অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাকে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ করেছেন।

হাকীমুল উম্মাত প্রায় পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু এগুলির সিংহভাগই দেশবিভাগের সময় হিজরত কালে নষ্ট হয়ে যায়। অবশিষ্ট গ্রন্থের প্রায় সবকটি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রকাশিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করতে গিয়ে আমি বইয়ের রচনার সাল ও প্রকাশ সন-তারিখ উল্লেখ করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়টির উল্লেখ না পাওয়ায় শুধু রচনাকাল বা শুধু প্রকাশকাল উল্লেখ করে ক্ষান্ত হয়েছি। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের সংস্করণের কপি শত চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হইনি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণের বই নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি। অভিসন্দর্ভটি রচনার সময়ে যেসব স্থানে আরবী, ফার্সী ও উর্দূ শব্দমালা এসেছে সেসব স্থানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বানান-রীতি মুতাবিক বাংলা উচ্চারণ দিতে চেষ্টা করেছি।

অত্র গবেষণা কর্মে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেন- আমার তত্ত্বাবধায়ক এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, গবেষক প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বাকী। তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতা, প্রগাঢ় পান্ডিত্য, আন্তরিক ভালোবাসা এবং গঠনমূলক দিকনির্দেশনা ও সমালোচনা আমার এই গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করেছে, আমাকে করেছে অনুপ্রাণিত এবং যুগিয়েছে সাহস। তাঁর অতুল্য ত্যাগ-শ্রম আমাকে ঋণী করেছে। গবেষণা কর্মে বিশেষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন আমার পারিবারিক অভিভাবক শ্রদ্ধেয় ছোট ভাইয়া মোঃ আবূ ইসলাম ও মেঝ আপু রাজিয়া সুলতানা। আরো যাঁরা সাহস যুগিয়েছেন- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও অত্র বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আ ম ম মাসুম বাকীবিল্লাহ। অভিভাবকসুলভ স্নেহ-মমতা ও উৎসাহ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন হাকীমুল উম্মাতের প্রিয় ছাত্র আমার প্রিয় শিক্ষাগুরু শাইখুল হাদীছ মুফতী আল্লামা মুহাম্মদ ওবাইদুল হক্ব নঈমী (র.আ.), অধ্যক্ষ হাফিজ কাজী মুহাম্মদ আব্দুল আলীম রিজভী, অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমীনুর রহমান, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আলম (এম.এ), উপাধ্যক্ষ মুফতী আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক ও মুফতী মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন আল-আযহারী। গবেষণা কাজে ও সামগ্রিক পথচলায় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন জনাব আব্দুল মুস্তফা মুহাম্মদ নাজির আহমদ চৌধুরী, ড. মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন নঈমী, মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন হেলাল, এডভোকেট মুহাম্মদ আরুছুর রহমান, আলহাজ্ব মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন জহুর, মুফতী আ স ম ইয়াকুব হুসাইন, জনাব মুহাম্মদ ফিরোজ খান ও ক্বাজী মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউদ্দিন মানিক। বিশেষ সহযোগিতা করেছেন হাসান মুহাম্মদ শারফুদ্দিন, হাফিয মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, হাফিয মুহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মুহাম্মদ হাশমত শাহীনসহ অনেকে। শেষের দিকে এসে আমার সহধর্মিণী জান্নাতুল মাওয়া তানিমা'র নিরন্তর উৎসাহ-অনুপ্রেরণা এবং আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবূ তৈয়ব চৌধুরী আল-কাদিরী সাহেবের তাগাদা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। এছাড়া যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন গবেষণার কাজে উদ্দীপনা-সাহস-অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে মহাজ্ঞানী আল্লাহপাকের সুমহান দরবারে প্রার্থনা- তিনি যেন হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.)-এর দারাজাত বুলন্দ করেন, তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর দ্বারা মুসলিম জাতির কল্যাণ-গৌরব সমুন্নত করেন এবং এই অযোগ্য বান্দার গবেষণা কর্মটুকু কবূল করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উভয় জগতে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমীন! বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

খ. প্রথম অধ্যায়ঃ

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) এর সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণঃ

সাধারণত লেখকের লেখায় তাঁর সময়ের বিভিন্ন চিত্র উঠে আসে। লেখনির মাধ্যমে তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভাষাচিত্র অংকন করে জাতির সামনে তা সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করে থাকেন। তাঁর এই লেখনী ভবিষ্যৎ জাতির জন্য অতীতের আয়না হয়ে সামনে আসে এবং সেই সময়ের ধারণা ও জ্ঞান প্রদান করে পরবর্তী জাতিকে শিক্ষা গ্রহণের পথ খুলে দেয়। হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.)-এর জন্মকালীন সময় ভারতীয় উমহাদেশ ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল। 'ইংরেজরা ভারতকে নিজেদের উপনিবেশে পরিণত করার জন্য এর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে ব্রিটিশ শাসকেরা একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেছে। শোষণ-শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে তারা ভারতবাসীর মনে হীনমন্যতার ধারণা সৃষ্টি করে'।[১] সাথে সাথে শাসনক্ষমতা স্থায়ীত্বের তরে ভারতবাসীদের মাঝে অবিশ্বাস-অনৈক্য সৃষ্টির জন্য তারা তাদের বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ পলিসি 'Divide & Rule' এবং জুলিয়াস সিজারের উক্তি 'Divide & Conquer' নীতির স্বার্থক প্রতিফলন ঘটিয়ে হিন্দু-মুসলিম মাঝে শুধু ফরাক তৈরি করেনি বরং উভয় ধর্মের মাঝে উগ্রপন্থার জন্ম দিয়ে দুই মতবাদের ভীতেও ফাটল লাগিয়ে দেয়; যার ফায়দা নিয়ে তারা এদেশ প্রায় দুইশত বছর (১৭৫৭-১৯৪৭) শাসন-শোষণ করে এবং মিশনারি কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের নিজ ধর্মও প্রচার-প্রসার করে। শতাব্দীকাল ধরে এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শান্তিপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সহাবস্থানের যে বিরল দৃষ্টান্ত বিশ্বমাঝারে রেখে যাচ্ছিল ইংরেজরা তার মূলে আঘাত করে খ্রিষ্টীয় সাংস্কৃতিক ধারার বীজ বপনের নীল নকশা বাস্তবায়নে উম্মত্ত হয়ে এদেশীয় সংস্কৃতি সমূলে ধ্বংস করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু বহুধা সাংস্কৃতিক ধারার গর্বিত জননীর সন্তানরা তা সফল হতে দেয়নি। ফলে ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু প্রায় দুইশত বছরে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ফাটল, ধর্মীয় চরমপন্থা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার যে বিষবৃক্ষ ইংরেজরা ভারতবাসী হিন্দু-মুসলিমদের মনের গহীনে বপন করে গেছে তাতে ভারতবাসী ততদিনে অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলে। ইংরেজরা ধর্মের ভিত্তিতে 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' (Two Nation Theory) ব্যবহার করে 'দেশবিভাগ'-এর মাধ্যমে এদেশীয় জনগণের মাঝে যে দূরত্ব এবং অবিশ্বাস জন্ম দিয়ে গেছে তার ফল আজো হিন্দু-মুসলমানরা বয়ে বেড়াচ্ছে; যার আজও মৌলিক খেসারত দিয়ে যাচ্ছে 'কাশ্মীরী জাতি'।[২]

---

[১]- সত্যসাধন চক্রবর্তী, অধ্যাপক ও নির্মল কান্তি ঘোষ, অধ্যাপক, ভারতের শাসন ব্যবস্থার ভূমিকা, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, গান্ধী রোড, কোলকাতা-ভারত; পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর-১৯৯৫খ্রি., পৃ.নং-৩৩।

[২]- হাকীমুল উম্মাত কাশ্মীরী জাতির প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি আন্তরিকভাবে চাইতেন কাশ্মীর পরিপূর্ণভাবে ভারত থেকে স্বাধীন হউক। এজন্য প্রয়োজনে তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগদিতেও আগ্রহী ছিলেন। কাশ্মীর স্বাধীন করার জন্য পাঠানরা আক্রমণ করলে তিনি ৩০০ রুপী দিয়ে একটি বন্দুক ক্রয় করে সৈন্যবাহিনীর ট্রেনিংয়ে যোগদান করেন। তাঁর প্রায় মাহফিল-এ 'খিলাফত' প্রতিষ্ঠার আহ্বান নিয়ে নাশীদ পাঠ করা হতো। এর মধ্যে অন্যতম এটি নাশীদ হলো-

اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ* تعمیر خلافت پیدا کر

کشمیر میں جنت بکتی ہے* وہ جان کے بدلے سستی ہے

اس جان کا کیا ہے جانی ہے* اس جان کی وقعت پیدا کر-

উঠো মুজাহিদ জাগ্রত হও! * জঝবা খিলাফত সৃষ্টি কর!
কাশ্মীরে জান্নাত বিক্রি হয় * তার তরে প্রাণ কিছুই নয়,
এই জীবনের উদ্দেশ্যই বা কী?* এই জানের তাৎপর্য তৈরি কর!

(সূত্র: নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, সাওয়ানিহ-এ ওমারী, নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান; ২০০৪খ্রি., পৃ.নং-১৭-১৮।

বিশেষত, মুসলমানদের নিজস্ব মতবাদের মধ্যে ধর্মীয় ফাটলের যে বীজ রোপিত হয়েছিল তা নানা ‘শাখা মতবাদ’ জন্ম দিয়ে ইসলামকে কলুষিত করে যাচ্ছে। হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) ইংরেজ শাসনের শেষের দিকে জন্ম নিয়ে ‘ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন’, ‘দেশবিভাগ’, সমাজবাদী চরমপন্থার উন্মেষ, ধর্মীয় চরমপন্থার উদ্ভব ও নানান মতবাদের প্রসার সবই অলক্ষ্যে অবলোকন করছিলেন। তাই আমরা তাঁর সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি, যা তাঁর লেখনির রসদ যুগিয়েছিল।

ক. সামাজিক অবস্থা:

ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে হাকীমুল উম্মাতের জন্ম। তাঁর পরিবার সমাজে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। দাদা মাওলানা মুনাওয়ার খান (র.আ) স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল্টির সদস্য ছিলেন। তাঁর পিতা সামাজিক সমস্যার শরয়ী‘ সমাধান দিতেন। এই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় স্বাধীকারের বাতাস বইতে শুরু করেছে। স্বভাবতই অস্থির এক সমাজে তাঁর ধরায় আগমন। ১৮৯৬-৯৭ সালের জাতীয় দূর্যোগে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ভারতীয় সমাজচিত্র পাল্টে দেয়।[১] তিনি পরাধীন ভারতীয় সমাজে জন্ম নিয়ে আশৈশব স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর ত্যাগ-আত্মনিবেদন অবলোকন করছিলেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের প্রত্যেক সচতেন ব্যক্তি হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে একই প্লাটফর্মে একত্রিত হচ্ছিলো। এসময় বৃটিশরাজ এদেশে রেল ব্যবস্থার প্রচলন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সামাজিক দূরত্ব কমে গিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি সঞ্চারিত হয়েছিলো। ‘বৃটিশ শাসনের পূর্বে এদেশ ছিল কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ। কিন্তু ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এদেশে শুরু হয় লাগামহীন শোষণের পালা’।[২] ১৭৯৩ সালের ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ ব্যবস্থার ফলে ভারতের এক কালের সমৃদ্ধ কৃষকসমাজ বণিক ও মহাজনদের নিকট ঋণগ্রস্ত হয়ে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অবনতি দেখা দেয়। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে দারুণ মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকের মজুরী কমতে থাকে। চাকুরীর সুযোগ না থাকায় শিক্ষিত যুবক শ্রেণি চরম হতাশার সম্মুখীন হয়। দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থা বেশি খারাপ হয়। ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে হতাশা দানা বেঁধে উঠে। জনগণের সমস্যার প্রতি সরকারের উদাসীনতা ও মৌনতা ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করে।[৩] ১৯০৫ সালে ১৭ জুলাই কোলকাতার জনসভায় সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দেন। ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলের আরেক জনসভায় তা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন হয়।[৪] সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্ষোভ জমতে থাকে। এক কথায় সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চরম অবনতির কালে হাকীমুল উম্মাত জন্ম গ্রহণ করেন।

---

[১]- ১৯৯৬-৯৭ সালে ভারতে এক ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ ও প্লেগ রোগের প্রাদূর্ভাব ঘটে। ইতিহাসবিদ ফ্রেজার ১৮৯৬-৯৭ সালের দূর্ভিক্ষকে ব্রিটিশ শাসকগণের অধীনে মারাত্মক দূর্ভিক্ষ হিসেবে বর্ণনা করেন। এতে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটে। সরকারকে প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হয়। সরকার দূর্যোগ মোকাবেলায় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও জনগণের দুঃখ-দূর্দশা মোচনে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এসব ঘটনার ফলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। (সূত্রঃ সাহা, দিলিপ কুমার, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস [১৮৫৭-১৯৪৭], ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরি, বাংলাবাজার-ঢাকা; তৃতীয় প্রকাশ-২০১৭খ্রি., পৃ.নং-১৩০)।

[২]- ঐ, পৃ.নং-০৩।

[৩]- ঐ, পৃ.নং-১৩১।
ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, ‘ভারতের সকল শ্রেণির মানুষ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিল’। বিজিত ভারতবাসীর প্রতি বিজয়ী শাসক শ্রেণির ঘৃণার মনোভাব ভারতীয়দের মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি করে। ইংরেজরা ভারতবাসীদের র্ববর মনে করত। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস স্বয়ং স্বীকার করে বলেন- A few years ago most of the English regarded the Indians almost as barbarians. (সূত্রঃ ঐ, পৃ.নং-০৪।)

[৪]- দেলোয়ার হোসেন, আবূ মোঃ, ড., বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১), বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি-২০১৮খ্রি., পৃ.নং-৫১।

খ. রাজনৈতিক অবস্থা:

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে পরস্পর অনাস্থা তৈরি হয়। যার ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। ১৮৭৫ সালে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দলের প্রকাশ ঘটে।[1] ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'ভারতীয় কাউন্সিল আইন' প্রণয়ন মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে। এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের যে রীতি প্রণীত হয়েছিল তা মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব প্রেরণে ব্যর্থ হয়।[2] ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় মুসলমানগণ এক অস্বস্তিকর অবস্থায় নিপতিত হয়। কারণ, ধর্মীয় দিকদিয়ে ভারতীয় মুসলিমরা তুরস্কের সুলতানের প্রতি অনুগত ছিলেন। অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত ছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ 'তুর্কী খিলাফত' রক্ষার ওয়াদা ভঙ্গ করে অটোমান সাম্রাজ্যকে খন্ড-বিখন্ড করে দেয় এবং থ্রেসকে গ্রিসের হাতে তুলে দিয়ে ফিলিস্তিনসহ 'ফার্টাইল ক্রিসেন্ট'কে নিজেরা হস্তগত করে নেয়। এতে ভারতীয় মুসলমানগণ চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হন।[3] প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে সর্বভারতীয় সেনা বৃটিশরাজকে একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার লাভের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তারা আক্রমনাত্মক নীতি গ্রহণ করে। ১৯১৯ সালে 'ভারত শাসন আইন' পাশ করলে গান্ধীজি 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন শুরু করেন।[4] একসাথে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন রুখার জন্য ১৯১৯ সালের কালাকানুন খ্যাত 'রাওলাট

---

[1]- লর্ড ডালহৌসি 'স্বত্ব বিলোপ নীতি'-এর মাধ্যমে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত করেন। কর্ণাটকের নবাব পদ বিলোপ করা হয়। এসব কারণে দেশীয় রাজ্য, দেশীয় সিপাহী ও জনসাধারণের মন ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়ে। ১৮৭৫ সালে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক শিক্ষার উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শিশির কুমার ঘোষের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়া লিগ' নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন হয়। এর পর ১৮৭৬ সালে ২৬ জুলাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ভারত সভা' নামে আরেকটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ.নং- ১০৪। ১৮৮৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের আহ্বানে কোলকাতায় জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। একই বছর হিন্দু নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে ২৮ডিসেম্বর বোম্বেতে দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে উমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'নিখিল ভারত কংগ্রেস' নামে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের জন্ম নেয়। (সূত্র:http://bn.banglapedia.org/index.php?ভারতীয়_জাতীয়_কংগ্রেস;https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_National_Congress.) স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদেরকে রাজনীতি থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। যার ফলে ১৮৭৭ সালে আমীর আলীর উদ্যোগে 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' গঠনের সাথে স্যার সৈয়দ আহমদ দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু কংগ্রেস আত্মপ্রকাশ করার পর হিন্দি এবং উর্দূর বিরোধ সৃষ্টি হলে মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে সৈয়দ আহমদ সচেতন হয়ে উঠেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের আনূকূল্য লাভের মানসে সর্বপ্রথম ১৮৮৬ সালে 'অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স' এবং ১৮৮৮ সালে 'ইন্ডিয়ান প্যার্ট্রিওটিক অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৯ সালে রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন (১৮৮৯)। ১৮৯৩ সালে উত্তর ভারতে 'মোহমেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অরগানাইজেশন অব আপার ইন্ডিয়া' গঠিত হয়। ১৯০৩ সালে সাহারানপুরে মুসলিম রাজনৈতিক সংস্থা গঠিত হয়। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাঞ্জাবে 'মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠিত হয়। এদিকে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র ভারত জুড়ে হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদ এবং মুসলিম বিদ্বেষের ঝড় বয়ে যাওয়ায় স্যার সলিমুল্লাহকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তোলে। তিনি সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম ঐক্যের কথা ভাবতে শুরু করেন। ১৯০৬ সালের নভেম্বরে সলিমুল্লাহ সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের নিকট পত্রালাপে নিজের অভিপ্রায় তুলে ধরলেন এবং সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘের প্রস্তাব রাখলেন। ১৯০৬ সালের ২৮-৩০ ডিসেম্বর সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন আহুত হল। ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সমগ্র ভারতের প্রায় ৮ হাজার প্রতিনিধি যোগ দিলেন। নবাব সলিমুল্লাহ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেন্সী' অর্থাৎ সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ গঠনের প্রস্তাব দেন; হাকীম আজমল খান, জাফর আলী এবং আরো কিছু প্রতিনিধি প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন। কিছু প্রতিনিধির আপত্তির প্রেক্ষিতে কনফেডারেন্সী শব্দটি পরিত্যাগ করে লীগ শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়। অবশেষে সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ঢাকায় এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করা হয়। এ সংগঠনের ব্যাপারে শুরু থেকেই হিন্দু জনগোষ্ঠী বিরূপ অবস্থান নেয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দি বেঙ্গলী পত্রিকা নবগঠিত 'মুসলিম লীগ'কে 'সলিমুল্লাহ লীগ' হিসেবে অভিহিত করে। মুসলমানদের অধিকাংশ নেতা এই দলে যোগ দেন। (সূত্রঃ দেলোয়ার হোসেন, আবূ মুহাম্মদ, ড., প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৪০-৪৩। সূত্রঃ http://bn.banglapedia.org/index.php?title=মুসলিম_লীগ;https://bn.wikipedia.org/wiki/নিখিল_ভারত_মুসলিম_লীগ.)

[2]- দেলোয়ার হোসেন, আবূ মুহাম্মদ, ড., প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৪২।

[3]- ১৯১৯ সালে বোম্বাইয়ের কতিপয় ব্যবসায়ী তুর্কী খলিফার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার জন্য 'মজলিশ-ই-খিলাফত' গঠন করে। উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে মৌলানা আব্দুল বারিকের নেতৃত্বে 'সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি' গঠন করে বিভিন্ন প্রদেশে এর শাখা খোলা হয়। ১৯১৯ সালের ১০ অক্টোবর খলিফার জন্য সারা ভারত জুড়ে একটি প্রার্থনা দিবস পালন করা হয়। বাংলায় এ. কে ফজলুল হক ও মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন গড়ে উঠে। (সূত্রঃ সাহা, দিলিপ কুমারঃ প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৯৪-৯৫।)

[4]- সাহা, দিলিপ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ.নং- ১৯৫ ও ১৯৯।

আইন’[1], শ্রমিক-মজুরের উপর দেশী-বিদেশী মালিকদের অত্যাচার-শোষণ বিরুদ্ধ আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।[2] মুসলিম সমাজে সংস্কার আন্দোলন অনেক দেরীতে শুরু হয়। অথচ হিন্দু সমাজে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝ হতেই। কংগ্রেস অসম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও ক্রমে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় অমনোযোগী হয়ে উঠে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী মনোভাব পর্যালোচনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন।[3] ফলে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্ভর ‘সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ’ নামে মুসলমানদের আলাদা রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তৈরি হয়। এ দলের নেতৃত্বেই ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর লাল-সবুজের পতাকা নিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। মৌলভী নজীর আহমদ নঈমী বলেন, ‘হাকীমুল উম্মাত মুসলিম লীগের প্রতি খুবই আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত হয়ে মুসলিম লীগকে পুরো ভারতীয় মুসলমানদের ভিত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করতেন’।[4]

গ. সাংস্কৃতিক অবস্থাঃ

‘দুনিয়ার প্রায় সব মানুষেরই একটা জীবন দর্শন রয়েছে। আর জীবন-দর্শনে যেহেতু পার্থক্য রয়েছে সেই কারণেই সংস্কৃতি-বিষয়ক ধারণা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতেও মৌলিক পার্থক্য হওয়া অবধারিত’।[5] ‘একই রকম পরিবেশে দীর্ঘকাল বসবাস সত্ত্বেও বিভিন্ন মানব দলের মধ্যে মনন ও চরিত্রগত পার্থক্য দেখা যায়, যা থেকে একটা গোষ্ঠি থেকে অন্য একটি গোষ্ঠিকে পৃথকভাবে চেনা যায়। সে কারণেই মানব প্রকৃতির মৌল ঐক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন রকম সংস্কৃতির জন্ম হয়’।[6] বহুজাতিক সংস্কৃতির মিলন ভূমি, সুদীর্ঘ শিক্ষা-ঐতিহ্যের উর্বর ক্ষেত্র ভারতীয় উপমহাদেশে হাকীমুল উম্মাতের জন্ম। ধর্মীয় উদার মনোভাবাপন্ন মোঘল শাসনের কারণে এদেশে জাতিগত সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটেছিল। হিন্দু-বৌদ্ধিক সংস্কৃতির মাঝে আরবগণ শাসন ক্ষমতার বাগডোর হাতে নিয়ে ইসলামী আরবীয় সংস্কৃতির ঝান্ডা নিয়ে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে এসে ভারতীয় সংস্কৃতিতে অনন্য মাত্রা যোগ করেছিল। মুসলিম সংস্কৃতি শান্ত-অনাড়ম্বর। এর গন্ডি পরিশীলিত ও সীমিত। ইংরেজদের আগমনের পর তাদের সংস্কৃতির মিশেলে শংকর সংস্কৃতির জন্মের ফলে এদেশে নানা ভাবধারার জন্ম নিয়েছিল। এর অধিকাংশই ইংরেজ মদদপুষ্ট। মুসলিম সংস্কৃতির মূলে আঘাত করাই ছিল এসব নব-ভাবধারার মূল উদ্দেশ্য। কারণ তারা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল মুসলমানদের থেকে। ইসলাম এসেছে ঈসায়ী ধর্মের উপর এবং এই ধর্মকে রহিত করে। ফলে খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের উপর ইসলামের উষালগ্ন হতেই খড়গহস্ত ছিলো। ১৯০০

---

[1]- প্রথম মহাযুদ্ধের বছরগুলোতে (বৃটিশদের ভাষায়) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চরমে পৌঁছলে তা দমনের জন্য সরকার ‘জরুরী আইন’ এবং ‘বিশেষ ক্ষমতা আইন’ চালু করে। এগুলোর মধ্যে ‘যুদ্ধকালীন ভারত রক্ষা আইন’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আইনের কার্যমেয়াদ শেষ হলেও যুদ্ধোত্তর বিপ্লবী আন্দোলন ও গণ-অসন্তোষ দমনের জন্য আইন সচিব মি. রাওলাটের নেতৃত্বে একটি কমিটি ১৯১৮ সালে দু’ধরণের আইন তৈরির সুপারিশ করলে সরকার দু’টি বিল তৈরি করে ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ভারতীয় আইন সভায় পাশ করে নেয়। এতে প্রথম বিলে- রাজদ্রোহ মামলার বিচারের জন্য আলাদা বিচারালয়, দ্বিতীয় বিলে- রুদ্ধদ্বার আদালতে বিনা উকিলের সাহায্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিচার করে অন্তরীন বা বিনা বিচারে আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে সরকার জাতীয় আন্দোলন স্তব্ধ করার ক্ষমতা পায়। গান্ধীজি এই আইনের সমালোচনা করে বলেছিলেন, ‘আপীল নেহী, দলীল নেহী, উকীল নেহী’। এর প্রতিবাদে আইনসভা সদস্য শঙ্কর ন্যায়ার পদত্যাগ করেন। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে এই আইনের বিরুদ্ধে সারা ভারতে একদিন অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে হরতাল পালিত হয়। প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৫৬-৫৭।

[2]- সত্যসাধন চক্রবর্তী, অধ্যাপক (১৯৩৩-২০১৮) ও নির্মল কান্তি ঘোষ, অধ্যাপক, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১২০।

[3]- ঐ, পৃ.নং-১১০।

[4]- নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৭।

[5]- মুহাম্মদ আবদুর রহীম, মাওলানা (১৩২৫হি./১৯১৮খ্রি.-১৩৯৪হি./১৯৮৭খ্রি.), শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, খায়রুন প্রকাশনী, বাংলাবাজার-ঢাকা; ৫ম প্রকাশ: মে-২০১১ ইং, পৃ.নং-২৭৫।

[6]- তারা চাঁদ, ডক্টর, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব (এস. মুজিব উল্লাহ্ অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা; তৃতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর-২০০৭/ ভাদ্র-১৪১৪/শাবান-১৪২৮. ISBN: 984-06-0011-7, পৃ.নং-১৯৫।

সালে ১৮ এপ্রিল যুক্ত প্রদেশে লে. জেনারেল এন্সনি ম্যাকডোনাস সরকারী কাজে হিন্দুদের ‘নাগরী লিপি’ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে মুসলমানদের বিক্ষুদ্ধ করেন। মুসলমানগণ এতে উর্দূর অবমূল্যায়ন দেখতে পায়। ভাষার উপর আঘাত আনায় আলীগড় কলেজের সেক্রেটারি নবাব মহসীন-উল-মুলক ১৯০০ সালের ১৩ মে প্রতিবাদ সভা করে নির্দেশনা পুনর্বিবেচনার দাবি জানান এবং উর্দূ ভাষা রক্ষার জন্য গড়ে তুলেন ‘উর্দূ রক্ষা সমিতি’। ১৯০২ সালে লে. জেনারেল জেমস লাটাচি উর্দূকে আগের মতো সরকারী ভাষার মর্যাদা দিলে এর সমাধান হয়। তা সত্বেও উর্দূ ভাষাকে কেন্দ্র করে ভারতের মুসলমানরা সংঘটিত হয়। এছাড়া কংগ্রেসের উগ্রপন্থী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকে[১] মুসলিম বিদ্বেষী অবস্থান নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে ‘গণপতি উৎসব’, ‘শিবাজী উৎসব’ ও ‘গো-নিধন বিরোধী আন্দোলন’ মুসলিম সংস্কৃতির মূলে আঘাত করে। মুসলমানরা নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় আরো সচেতন হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে গতি আনার চেষ্টা করেন।[২] এমতাবস্থায় ইসলামী সংস্কৃতির ধ্বজা হাতে নিয়ে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.)-এর আগমন। তিনি অপসংস্কৃতি মুক্ত সুস্থ ইসলামী সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

ঘ. ধর্মীয় অবস্থাঃ

হাকীমুল উম্মাতের জন্ম লগ্নে ব্রিটিশ-ভারতের ধর্মীয় অবস্থার উপর খ্রিষ্টান মিশনারিদের থাবা সকল শ্রেণির ধর্মানুসারীদের মনে ভীতি সঞ্চার করেছিল। ইতঃপূর্বে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানে এদেশে শান্তিপূর্ণ ধর্ম-কর্ম চলছিলো। ১৮৫৭ সালে আর ডি ম্যাংগলেস ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ‘হাউজ অব কমন্স’-এ প্রদত্ত ভাষণে বলেন, “খ্রিষ্টধর্মের বিজয় পতাকা ভরতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সগৌরবে উড্ডীন রাখার জন্যই ভাগ্যবিধাতা হিন্দুস্থানের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ইংল্যান্ডের হাতে তুলে দিয়েছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কাজে প্রত্যেককেই আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে”।[৩] এই ভাষণের পর খ্রিষ্টান মিশনারিদের তৎপরতার ফলে ভারতীয়দের মনে আশংকার জন্ম দেয় যে, ইংরেজ শাসনে তারা ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য। খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রকাশ্যভাবে ধর্ম প্রচার, হিন্দু-মুসলমানদিগকে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা, বিদ্যালয়-হাসপাতাল-জেলখানায় খ্রিষ্টান পাদ্রীদের অবাধ যাতায়াত হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দারুন আশঙ্কার সৃষ্টি করে। ব্রিটিশরা মসজিদ, মন্দির, দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার উপর করভার আরোপ করলে ভারতীয়দের ধর্মীয় চেতনায় চরম আঘাত হানে। ‘১৮৯০ সালে ভারত সরকার খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারীকে তার পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবে না মর্মে আইন পাশ করলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রমাদ গুনে’।[৪] শিক্ষিত সমাজ এব্যাপারে বেশি সচেতন ছিলো। কিন্তু জাত-পাতের যাতাকলে নিস্পেষিত দরিদ্র গ্রাম্য-অশিক্ষিত সমাজ মিশনারিদের খপ্পরে পড়ে বেশি ধর্মান্তরিত হয়েছিলো। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা কংগ্রেসকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ সৃষ্টি করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করেছিলো। এছাড়া মুসমানদের মধ্যে কিছু ধর্মীয় উপদল জন্ম নিলে এর মৌলিক-আদি চিন্তাধারায় অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। ‘নজদী-ওয়াহাবী আন্দোলন’[৫], ‘এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল

---

[১]- তার সাথে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী অরবিন্দ ঘোষের মতো উগ্র-হিন্দুত্ববাদী বুদ্ধিজীরাও উঠেপড়ে লেগেছিল। (সূত্রঃ দেলোয়ার হোসেন, আবূ মোঃ ড., প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৫০-৫১।)

[২]- ঐ, পৃ.নং- ৪৩।

[৩]- সাহা, দিলিপ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-০৫।

[৪]- ঐ।

[৫]- ওয়াহাবীবাদ (আরবী: الوهابية, আল-ওয়াহ্হাবীয়া) একটি ইসলামী মতবাদ এবং ধর্মীয় আন্দোলন, যা মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব প্রতিষ্ঠিত। এটি শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনু তাইমিয়া আল-হাম্বলী (৬৬১হি./১২৬৩খ্রি.-৭২৮হি./১৩২৮খ্রি.)-এর ধর্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ওয়াহাবীবাদের নামকরণ হয়েছে আঠারো শতকের প্রচারক ও কর্মী মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (১৭০৩-১৭৯২)-এর নামানুসারে। তাঁর জন্ম নজদ প্রদেশে (বর্তমান রিয়াদ)। মূলত তাঁর নামানুসারে এই আন্দোলনের নাম হয়েছে। তিনি নজদের প্রত্যন্ত, বিচ্ছিন্ন জনবহুল অঞ্চলে একটি সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং আইনশাস্ত্রের হাম্বলী স্কুল অনুসরণ করেন। ওয়াহাবী মিশন নজদের প্রত্যন্ত শুকনো অঞ্চলে একটি

ভাবধারা'[১] 'কাদিয়ানী ভাবধারা'[২], তার অন্যতম। 'হাকীমুল উম্মাতের এলাকায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন ছিলো। একই এলাকাতে হিন্দু-মুসলিম-শিখ ধর্মাবলম্বীরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতো। বিভিন্ন পৌষ-পার্বনে তারা এক অপরকে যোগদানের দাওয়াত প্রদান করতো। এর ফলে মুসলিম ধর্মীয় রীতিতে অনৈসলামিক কিছু রীতি-নীতি প্রবেশও করেছিল। এজন্য হাকীমুল উম্মাত পরবর্তীতে এইসব কুসংস্কার ও মন্দ বিদ'আতের বিরুদ্ধে ইসলামী সংস্কৃতি কী তা

পুনর্জাগরণ আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়েছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে আল-সৌদ বংশ এবং ওয়াহাবীবাদ পবিত্র শহর মক্কা ও মদীনায় ছড়িয়ে পড়ে। (সূত্রঃ https://bn.wikipedia.org/wiki/ওয়াহাবিবাদ)

বর্তমান আরবীয় ওহাবী আন্দোলনের দাবী- তারা সর্বপ্রকার শিরকী কর্মকান্ড দূর করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তারা কুরআন ও হাদীছ শরীফের অত্যন্ত আক্ষরিক এবং চরমপন্থী ব্যাখ্যা অনুসরণের কারণে তাদের বিরোধী মতাবলম্বীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাফির-মুশরিক মনে করে। যার ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন স্পষ্টতর হয়ে উঠছে দিন দিন। এই অন্তর্দ্বন্ধ ইসলামের দখলদার শত্রুদের হাতে একটি মারাত্মক অস্ত্র তুলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যে অস্ত্র ইসলামের শত্রুরা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে মুসলিম বিভাজনের জন্য ব্যবহার করবে। সুতরাং এটা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে মুসলিম নিধনের পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। (সূত্রঃ Mahrnud Najrn Al-Arniri, Said: The Birth of Al-Wahabi Movment & it's Historic Roots. (2002) General Military Intelligence Directorate, Republic of Iraq. p.n-06).

(Wahabi movements):- ভারতবর্ষে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীর অধিবাসী সৈয়দ আহমদ (১২০১হি./১৭৮৬খ্রি.-১২৪৬হি./১৮৩১খ্রি.) এবং তাঁর অনুগামীদের নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলন অচিরেই একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। তার প্রধান দুই শিষ্য শাহ ওলী উল্লাহ-এর পরিবারের সদস্য মৌলভী ইসমাঈল দিহলভী ও মৌলভী আবদুল হাই লখনৌভী। তন্মধ্যে মৌলভী ইসমাঈল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাবের 'কিতাবুত তাওহীদ'-এর উর্দূ ভাষ্য 'তাকভীয়াতুল ঈমান' এবং অন্য একটি গ্রন্থ 'সীরাতে মুস্তাকীম' রচনা করে তাঁর শিক্ষা প্রচার করেন। আব্দুল মওদুদ বলেন, '১২৩৩ হিজরীতে প্রকাশিত 'সীরাতে মুস্তাকীম' ভারতীয় মুসলমানদের নিকট কুরআনের মতোই শ্রদ্ধার বস্তু। তাতে দেখা যায় যে, সৈয়দ আহমদ যেন স্বপ্নাদেশ পেয়েই মুরশীদের স্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং নিজের মতবাদ প্রচার করতে মুরীদ করতে থাকেন। বহু লোক তাঁর মুরীদ হন। তিনি একজন ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন। বহু আলিম তাঁর মুরীদ হন। (সূত্রঃ বিচারপতি আব্দুল মওদুদ (১৯০১-১৯৭০খ্রি.): ওহাবী আন্দোলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, জিন্দাবাজার-ঢাকা, ১৬ সেপ্টেম্বর-১৯৬৯খ্রি., পৃ.নং-১৩-১৪; মালিক রাম (১৩২৪হি./১৯০৬খ্রি.-১৪১৩হি./১৯৯৩খ্রি.), তাযকিরাহ মাহ ও সাল, মাকতাবাহ জামেয়া লিমিটেড, নতুন দিল্লি, ভারত, ১৯৯১খ্রি., পৃ.নং-২৩; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা; দ্বিতীয় সংস্করণ: আষাঢ়-১৪১৩/জুন-২০০৬/জুমাদল আউয়াল-১৪২৭, খন্ড-০৩, পৃ.নং-৫৮৭)

[১]- স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮খ্রি.) এই মতধারার প্রবক্তা ছিলেন। ভারতের একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ, যিনি ভারতের মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন। তিনি এই কাজের জন্যই ১৮৭৫ সালে মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' নামে পরিচিতি লাভ করে। তার চিন্তাধারা ও কাজকর্ম সেখানকার মুসলিমদের মধ্যে একটি নতুন চেতনার জন্ম দেয়। তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাই পরবর্তীতে 'আলীগড় আন্দোলন'-এর সূচনা করেন যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিমদের অধিকার নিশ্চিত করা। তাঁর এই সংস্কারবাদী চিন্তাধারা অনেকাংশই পশ্চিমা দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তিনি নানাভাবে সমালোচিত হন।

[২]- মির্যা গোলাম আহমদ (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫-২৬ মে ১৯০৮) একজন ভারতীয় ধর্মীয় নেতা এবং 'আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'আত' নামক এক ধর্মের প্রবর্তক। তাঁর দাবী মতে, তিনি ১৪ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (আধ্যাত্মিক সংস্কারক), প্রতিশ্রুত মসীহ, মাহ্দী এবং খলিফা। তার দল আহমদীয়া মুসলিম জামা'আত (উর্দু: احمدیہ مسلم جماعت; আরবী: الجماعة الإسلامية الأحمدية) একটি মুসলিম ধর্মীয় পুনর্জাগরণ অথবা মসীহবাদী আন্দোলন যার উদ্ভব হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ ভারতের কাদিয়ান এলাকার মির্যা গোলাম আহমদের জীবন ও শিক্ষার ভিত্তিতে। মির্যা গোলাম আহমদ (১৮৩৫-১৯০৮) দাবী করেছিলেন যে আল্লাহ তাকে আখেরী জামানায় প্রতিশ্রুত ও মুসলমানদের প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (যীশু বা ঈসা) উভয় হিসেবেই প্রেরণ করেছেন; ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় শান্তিপূর্ণভাবে সংঘটিত করতে এবং অন্যান্য ধর্মীয় মতবাদের প্রতীক্ষিত পরকালতাত্ত্বিক ব্যক্তিদের মূর্ত করতে। নাবী মুহাম্মদের বিকল্প নাম 'আহমদ' থেকে এই আন্দোলন ও সদস্যগণ ('আহমদীয়া মুসলিম' বা সংক্ষেপে 'আহমদী') নিজেদের নামকরণ করলেও সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বে তাদের প্রতিষ্ঠাতার জন্মগ্রহণকারী অঞ্চলের নাম কাদিয়ান এর নামে কাদিয়ানী হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়।

আহমদীয়ারা বিশ্বাস করে যে মির্যা গোলাম আহমদ ইসলামকে তার আসল প্রথমযুগীয় অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিতাবে উল্লিখিত যীশু বা ঈসার গুণবিশিষ্ট ইমাম মাহদী হয়ে এসেছেন ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে এর নৈতিক ব্যবস্থা চলমান করতে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, মির্যা গোলাম আহমদ ইসলামের শেষ নাবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রদর্শিত পথে পাঠানো একজন "উম্মাতী নাবী"। তাদের মতে 'খাতামান্নাবিঈন'-এর অর্থ নবুয়াত এর সমাপ্তি নয় বরং 'খাতামান্নাবিঈন' মানে "নাবীগণের মোহর" বা নাবীগণের সত্যায়নকারী। তাদের মতে নাবী মুহাম্মদ এর প্রকৃত অনুসরণে নতুন নাবী আসতে পারবেন তবে তিনি হবেন 'উম্মাতী নাবী' ও তিনি কোনো নতুন শরীআত আনবেন না। মুসলমানদের মতে, এই 'উম্মাতী নাবীর' ধারণা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা সমর্থিত নয় এবং তারা তাদেরকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত মানে না। আহমদীয়াদের মতে- যেহেতু তারা কালিমা তৈয়বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে বলে তাদের 'অমুসলিম' ঘোষণা করার অধিকার কারো নেই। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কার্যক্রম ক্রমবর্ধমান। পৃথিবীর ২১৩ দেশে আহমদিয়াদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই সংগঠনের বর্তমান কেন্দ্র লন্ডনে অবস্থিত। গোলাম আহমদের মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা খিলাফত প্রবর্তন করে এবং তাদের নির্বাচিত ৫ম খলিফা মির্যা মাসরুর আহমেদ লন্ডন থেকে এই সংগঠনের কার্যক্রমের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। আহমদী বিশ্বাস ও কর্মকান্ডকে 'আহ্মদীয়াত' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। (সূত্রঃ https://bn.wikipedia.org/wiki/মির্যা_গোলাম_আহমদ. সূত্রঃ https://bn.wikipedia.org/wiki/আহ্%E2%80%8Cমদীয়া.)

পালনের নিমিত্বে ‘ইসলামী যিন্দেগী’ নামে এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করে তার মূলোৎপাটন করেন। মোঘল আমল হতে ভারতের দাপ্তরিক ভাষা ছিল ফার্সী। ‘ফার্সী রাষ্ট্রভাষা ছিল বলে চাকরি-বাকরি, প্রতিপত্তি ও মান-ইজ্জত লাভের জন্যই এদেশের মানুষকে ফার্সী শিখতে হতো’।[১] তাই ‘তাঁর বাবার কাছে মুসলিম শিশুদের সাথে সাথে হিন্দু ছেলে-মেয়েরাও ফার্সী ভাষা শিক্ষালাভ করতে সমাগত হতো। তিনি অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্যও করতেন। তাঁর পিতার মৃত্যুতে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরাই বেশি ক্রন্দন করেছিলো’।[২] মোট কথা, তিনি ও তাঁর পরিবার হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রেখে ইসলাম চর্চায় অবদান রাখেন।

---

[১]- মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, ড., বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দূতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০১-১৯৭১), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ-১৪১২, এপ্রিল-২০০৫, রবিউল আউয়াল-১৪২৬; ISBN : 984-06-1014-7, পৃ.নং- ০৭।

[২]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, মাওলানা, হায়াত-এ হাকীমুল উম্মাত, নাঈমী কুতুবখানা, লাহোর-পাকিস্তান; ২০১১খ্রি., পৃ.নং-২৮।

গ. দ্বিতীয় অধ্যায়:

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) এর জীবন ও কর্ম:

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের যে কজন বিশ্ববরেণ্য আলিমেদ্বীন জগৎবাসীকে তাদের চিন্তাধারা ও লেখনীর মাধ্যমে তৃপ্ত করেছেন এবং ইসলামের সঠিক মতবাদ 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর আক্বীদাকে কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা-ক্বিয়াসের দলীল সহকারে সহজ-সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন আর সাধারণ মুসলমানের ঈমান-আমলকে ভন্ড-প্রতারক-বাতিল সম্প্রদায়ের আক্রমণ থেকে রক্ষার বাক ও কলমী যুদ্ধ চালিছেন; তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী কাদিরী (র.আ.)। তিনি শরয়ী' জ্ঞানে সমৃদ্ধ সালফ-এ সালিহীনের অনূসৃত সূফী ভাবধারার বিশ্বাস ও কর্মনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সমকালীন সময়ের বিদগ্ধ, বাকপটু ও দূরদর্শী বিতার্কিক এই স্কলার বাতিল-ভন্ড সম্প্রদায়ের জন্য সুনামিস্বরূপ ছিলেন। বির্তক যুদ্ধে অপরাজেয় এই সৈনিক সর্বদা বিজয়ী করেছেন ইসলামী ব্যবস্থাকে। তাঁর সুলিখনী বাতিল দূর্গে এটমবোমার মতো আঘাত হেনে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে আর তাঁকে দিয়েছে জগৎসমাজে পবিত্র-স্মরণীয়-বরণীয় জীবন[১]। ইসলামের শুদ্ধতা রক্ষা, সমকালীন উদ্ভূত সমস্যার যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান প্রদান এবং মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশাল অবদানের কারণে তৎকালীন আলিম সমাজ এই মহান মনীষীকে "হাকীমুল উম্মাত" উপাধিতে ভূষিত করেন[২]। নিম্নে তাঁর কর্মবহুল জীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করা হলো।

শুভজন্ম ও নামকরণ:

মুফতী-এ ইসলাম হাকীমুল উম্মাত বিশ্ববরেণ্যে মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আহমদ ইয়ার খান নঈমী বাদায়ূনী (র.আ.) ০৪ জুমাদাল উলা ১৩১৪ হিজরী মুতাবিক ০১ মার্চ ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে শুক্রবার সুবাহ সাদিক্ব-এর সময় তৎকালীন হিন্দুস্থানের উত্তর প্রদেশের বাদায়ূন জেলার উজাহান গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম আফগান বংশোদ্ভূত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] তাঁর পিতার নাম: মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ার খান ও তাঁর দাদার নাম: মাওলানা মুনাওয়ার খান । জন্মের পর তাঁর নাম পরদাদা কালে খান ওরফে মঞ্জুর আলী খানের নামে রাখা হয় মঞ্জুর খান। কিন্তু তিনি এ নামে প্রসিদ্ধি পাননি। আহমদ ইয়ার খান নামে ইসলামী বিশ্বে এক নামে পরিচিতি লাভ করেন[৪]। তাঁর ছন্দাসিক নাম: সালিক বাদায়ূনী[৫]। উপাধি:

---

[১]- আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন-

১. "বিশ্বাসী হয়ে যে পুরুষ-নারী সৎকর্ম করেছে তাঁদেরকে আমি পবিত্র প্রাণে পূনর্জীবন দান করবো"। (আন-নাহল, ১৬:৯৭)

২. "আর বিশ্বাসী হয়ে যে পুরুষ-নারী সৎকর্ম করবে তাঁরা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (আন-নিসা, ০৪:১২৪)

৩. "আর বিশ্বাসী হয়ে যে পুরুষ-নারী সৎকর্ম করেছে তাঁরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (আল-মু'মিন, ৪০:৪০)

[২]- 'নূরুল ইরফান' নামে পবিত্র কুরআনুল কারীম-এর টীকা-টীপ্পনী সমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থ রচনার পর লাহোরের নূরী কুতুবখানার মালিক পীর সৈয়্যদ মা'সুম শাহ নাওশাহী (র.আ) আহ্বানে তৎকালীন আজাদী আন্দোলনের শরীকদার পাকিস্তানের বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের একটি দল তাঁকে ১৯৫৭ সালে 'হাকীমুল উম্মাত' উপাধীতে ভূষিত করেন। তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- পীর সৈয়্যদ মা'সুম শাহ নাওশাহী (১৩১৬/১৮৯৮-১৩৮৮/১৯৬৯), সৈয়্যদ আবুল কামাল বরক নাওশাহী, শাইখুল হাদীছ আল্লামা আব্দুল গফুর হাযারভী, শাইখুল হাদীছ আল্লামা সর্দার আহমদ লাইলপুরী, গাজ্জালী-এ যামান আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ সাঈদ কাজেমী (১৯১৩খ্রি.-১৯৮৪খ্রি.), পীর সৈয়্যদ মুহাম্মদ হুসাইন শাহ ইবনে পীর সৈয়্যদ জামা'আত আলী শাহ মুহাদ্দিস আলীপুরী, খতীব-এ আজম গুজরাট আল্লামা ক্বারী আহমদ হুসাইন (১৯১৪-১৯৬০) সহ তৎকালীন বিদগ্ধ ইসলামী পন্ডিতগণ। নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১০; বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, হালাত-এ যিন্দেগী, নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান; ২০০৪খ্রি., পৃ.নং-০৭।

[৩]- নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-০৯; আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২৬; আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী (১৯৩৬-১৯৭৮খ্রি.), হায়াত-এ সালিক, নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান; ২০০৪খ্রি.,পৃ.নং-০৮; বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-০৭। শাইখ বিলাল আহমদ সিদ্দিকী বলেন, তাঁর জন্ম তারিখ উজাহানের সরকারী দপ্তরে এরূপ রেজিস্ট্রারকৃত রয়েছে। বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-০৭। মুক্তাদারা ক্বাওমী যবান, ইসলামাবাদ হতে প্রকাশিত প্রফেসর মুহাম্মদ আসলাম রচিত "ওয়াফিয়াত মাশাহীর-এ পাকিস্তান" গ্রন্থের ১৭ পৃষ্টায় ১৯০৬ সালে জন্মসন উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া উইকিপিডিয়াসহ কয়েকটি অনলাইন তথ্যভান্ডারে তাঁর জন্মসাল ১৯০৫ খিষ্টাব্দ/১৩২৪ হিজরীও দেখানো হয়েছে।

[৪]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২৬।

[৫]- নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১০।

হাকীমুল উম্মাত, মুফতী-এ ইসলাম[১]। নামের শেষে তরীক্বতের দিকে নিসবত করে ক্বাদিরী, আশরাফী লিখতেন।

বংশ পরিচিতি:

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) পিতৃ দিকে ছিলেন "ইউসূফজাঈ"[২] বংশীয় পাঠান; যার বংশনামা হযরত বিনইয়ামিন বিন ইয়াকুব আলাইহিমাস সালামের সাথে মিলে। মাতৃদিকে তিনি আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশের সাথে যুক্ত। পিতৃ-মাতৃকূল উভয়দিকে তিনি জ্ঞানী বংশেই জন্ম গ্রহণ করেন।[৩] তাঁর পঞ্চম উর্দ্ধতন পুরুষ জনাব ইমাম আলী খান গিরদিজী আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশের বাদায়ুন জেলার উজাহান নামক জায়গায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইয়ার খান (র.আ.) একজন দ্বীনদার ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দাদা মাওলানা মুনাওয়ার খান (র.আ.) উজাহান (বদায়ুন)-এ একটি জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পিতা দীর্ঘ ৪৫ বছর বিনা পারিশ্রমিকে ইমামত-খেতাবত এর দায়িত্ব পালন করেন। মসজিদের যাবতীয় খরচাপাতিও তিনি বহন করতেন। পিতা-দাদা উভয়ে ফার্সী ভাষার পন্ডিত ছিলেন। তাঁরা নিজগৃহে বাচ্চাদের পাঠদান করতেন। মুসলিম-হিন্দু বাচ্চাদের ফার্সী শিখাতেন। গরীব শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্যও করতেন। অত্র এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় মান্যবর ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর পিতা অত্যন্ত নামায প্রেমিক ছিলেন। শেষ বয়সে দৃষ্টি বিভ্রাট শুরু হলেও জামাত ত্যাগ করতেন না। তাঁর মৃত্যুতে মুসলিম-হিন্দু সবাই শোকাতুর হয়ে পড়ে। এই মহান ব্যক্তির ঔরশে পরপর পাঁচটি কন্যা সন্তান জন্ম লাভের পর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অতি আকাঙ্খিত আদরের সন্তানের নাম রাখা হলো- আহমদ ইয়ার খান। এ সন্তান বড় হয়ে প্রমাণ করলেন যে, তিনি বাস্তবিকপক্ষেই "আহমদ ইয়ার" বা নবীপ্রেমিক।[৪] পিতা মান্নত করেছিলেন যদি পুত্র সন্তান হয় তবে তাকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গিত করবেন। মান্নত অনুযায়ী তিনি ছেলের দ্বারা জীবনে দুনিয়াবী কোন কাজ করাননি। তাঁকে পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। পরে ঐ ছেলে পুরো মুসলিম মিল্লাতের রাহবারে পরিণত হয়ে পিতার ওয়াদা পূর্ণ করে দেন।[৫]

তাঁর জন্মস্থল বাদায়ূন তৎকালে দিল্লির মতো সুপ্রসিদ্ধ ছিল। বড় বড় ব্যক্তির (ওয়ালী-আলিমের) সম্পর্ক এই শহরের সাথে ছিল। হাকীমুল উম্মাতের পরিবার তাঁদের সঙ্গ (সোহবত) লাভ করে নিজেদের ধন্য করেছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- হযরত খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া

---

[১]- ইলমু মিরাসের উপর ১৯১২ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে এক বড় ফতোয়া লেখার উপর অত্যন্ত খুশী হয়ে স্বীয় উস্তাদ সদরুল আফাযীল বদরুল আমাসীল আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.আ.) তাঁকে "মুফতী-এ ইসলাম" উপাধীতে ভূষিত করেন এবং এই দিনেই তাঁকে জা'মেয়া নাঈমীয়া-মুরাদাবাদের মুফতী পদে নিয়োগ দেয়া হয়। নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১১।

[২]- ইউসুফজাঈ: আক্ষরিক অর্থে ইউসুফের বংশধর (ইউসুফ খান ইবনে মান্দে খান)। পাকিস্তান ও আফাগানিস্তানের কিছু পূর্ব অংশ এবং উত্তর ভারতে মুহাজির হিসাবে আসা পশতুন সম্প্রদায়ের একটি উপজাতি। ইউসুফজাঈ পশতুনরা কাবুলে মোঘলদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত ও তাদের সর্দার নিহত হলে পরে কাবুলের মুঘল গভর্নর কাবুল উপত্যকা থেকে এদের বহিষ্কার করেন। এরপর তারা সোয়াত উপত্যকায় পৌঁছেছিলেন। ইউসুফজাঈরা মুঘল বাদশা আকবরের শাসনের সাথে সহযোগিতা করেনি। ফলে তিনি ১৫৮৫ সালের শেষদিকে জয়েন খান খোকা এবং রাজা বীর বলের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী তাদের পরাধীন করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ১৫৮৬ সালের ফেব্রুয়াারিতে রাজা বীর বল ইউসুফজাঈদের সাথে যুদ্ধে নিহত হন। ইউসুফজাঈদের নেতৃত্ব দেন সেনাপতি গুজ্জু খান। ইউসুফজাঈ উপজাতিরা ১৬৬৭ সালে 'ইউসুফজাঈ বিদ্রোহ'-এর সময় মোগল শাসনের বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং অটকের কাছে মোগল বাহিনীর সাথে পীচ-যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৬৯০ সালের দিকে এই এলাকাসমূহ আংশিকভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। ১৮৪৯ সালে ইউসুফজাঈরা আখন্দ আবদুল গাফূরের নেতৃত্বে সোয়াতে তাদের নিজস্ব ইউসুফজাঈ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তারা তাদের পীর বাবার বংশধর সাইয়্যিদ আকবর শাহকে প্রথম আমীর হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে আকবর শাহের মৃত্যুর পর আখন্দ গফূর নিজেই রাজ্যটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রটি ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। https://en.wikipedia.org/wiki/Yusufzai.

[৩]- নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-০৯।

[৪]- শারফুদ্দিন, হাসান মুহাম্মদ, হাকিমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমি, প্রবন্ধ-রাহমাতুল্লিল আলামীন, বার্ষিক প্রকাশনা, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদরাসা, মোহাম্মদপুর-ঢাকা; প্রকাশকাল-২০১৪, পৃ.নং-১৮৪।

[৫]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২৬।

(৬৩৩হি./১২৩৮খ্রি.-৭২৫হি./১৩২৫খ্রি.) বাদায়ূনী দিহলভী (র.আ.)[১], আল্লামা আলাউদ্দীন উসূলী বাদায়ূনী (র.আ.) (ইনি খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া-এর ওস্তাদ ছিলেন), আল্লামা কাজী জামালউদ্দীন (৬৫৯-৭৩৫হি.) বাদায়ূনী মুলতানী (র.আ.) আল্লামা মুফ্‌তী রুকনুদ্দীন (১২৫১-১৩৩৫খ্রি.) হানাফী বাদায়ূনী (র.আ.) (ফিক্বহের কিতাব রুকনুদ্দীনের লেখক) ও মাওলানা খাজা বখ্‌শ বাদায়ূনী (র.আ.) সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য[২]।

হাকীমুল উম্মাতের বংশনামা হলো- আহমদ ইয়ার খান ইবনে মুহাম্মদ ইয়ার খান বিন মুনাওয়ার খান বিন কালে খান (মূল নাম মনজুর আলী খান) বিন বেশারত আলী খান বিন নজাবত আলী খান বিন ইমাম আলী খান বিন আহমদ আলী খান বিন মাহমূদ আলী খান বিন কাসেম আলী খান বিন আশরাফ আলী খান বিন ইতরত আলী খান বিন উমদা আলী খান বিন বাজ খান বিন গাইরত খান গজনি বিন মুরাদ আলী খান বিন মূসা খান বিন ইউসুফ খান (ইনি হলেন বিখ্যাত ইউসুফজাঈ পাঠান বংশের প্রাণপুরুষ) বিন মান্দে খান বিন সাখি বিন কিন্দার বিন খারশাবু (খাইরুদ্দিন) বিন সরাইন বিন কাইস আব্দুর রাশিদ (ওফাত-২৩২হি./৮৪১খৃ.) বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান বিন ঈদাইন বিন খালিদ বিন কাইস ফাতান বিন নুয়াইম বিন আইস বিন সালূল বিন ওতবাহ বিন নঈম বিন মারি’ই বিন আবূ জনদর বিন সিকান্দার যুলকারনাইন বিন রজমান বিন আইমান বিন মালুল বিন শলম বিন সালাহ্ বিন কাদির বিন আজীম বিন ফিহলুল বিন করম বিন মুহাল বিন হুজাইফা বিন মিনহাছ বিন আইস (কাইস) বিন গুলাইম (গালিম) বিন শুমূঈল বিন হারুন বিন কামারদার বিন লাহী বিন সুলাইব বিন ত্বালাল (ত্বাল) বিন লুই বিন আমীল বিন তারুখ বিন আরজনদ বিন আবূ মানদুল বিন সালিম বিন আফগানাহ বিন জাহ্ বিন আরমিয়াহ (ইয়ারমিয়াহ) বিন সাদাল বিন কাইস বিন মাহলীল বিন আলিম (আগদু’উ) বিন সুরু‘উ বিন বিনইয়ামিন বিন ইয়াকুব (আ.) বিন ইসহাক (আ.) বিন ইবরাহিম (আ.) ইবনে তারুখ বিন নাখুর বিন সুরুজ বিন রাউ’ বিন ফালিজ বিন গাবির বিন হুদ (আ.) বিন আবির বিন শালিহ্ বিন আবওয়াঝ বিন ফাহশাদ বিন সাম বিন নূহ (আ.)[৩]। হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত অবশিষ্ট বংশনামা হলো- হযরত নূহ বিন লামিক/লমক বিন মাতুয়াশলাখা বিন আখনুখ/ইদ্‌রীস বিন ইয়ার্দ বিন মাহলাঈল বিন ক্বায়নান বিন আ’নুশ বিন শীষ বিন আদম আলাইহিমুস সালাম।[৪]

---

[১]- সুলতান-উল-মাশায়েখ, মাহবুব-এ ইলাহী, শেখ খাজা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ নিজামুদ্দীন আউলিয়া (১২৩৮- ৩ এপ্রিল ১৩২৫) (উর্দূঃ حضرت شیخ خواجہ سیّد محمد نظام الدّین اولیاء), হযরত নিজামুদ্দীন নামেও পরিচিত, হলেন ভারতীয় উপমহাদেশে চিশতীয়া ত্বরীকার একজন প্রখ্যাত সূফী সাধক। তাঁর ত্বরীকার সিলসিলা বাবা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকার, কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার খাকী হয়ে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর সাথে মিলিত হয়। এই অনুযায়ী তাঁরা চিশতীয়া ত্বরীকা মৌলিক আধ্যাত্মিক ধারাবাহিকতা বা সিলসিলা তৈরি করেছেন, যা ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। নিজামুদ্দীন আউলিয়া তাঁর পূর্বসূরীদের ন্যায় প্রেম বা ইশককে স্রষ্টা বা আল্লাহ প্রাপ্তির পন্থা বা পথ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার মতে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা মানবতার প্রতি ভালবাসার জন্ম দেয়। জিয়াউদ্দীন বারানী নামে চৌদ্দ শতকের একজন ঐতিহাসিক দাবী করেন যে, ‘দিল্লির মুসলমানদের উপর তার প্রভাব এমন ছিল যে পার্থিব ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হয়। মানুষ আধ্যাত্মিকতা এবং ইবাদতের প্রতি মনোযোগী এবং দুনিয়াবী চিন্তা থেকে পৃথক হয়ে পড়ে’। (সূত্রঃ https://bn.wikipedia.org/wiki/নিজামুদ্দিন_আউলিয়া)

[২]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. নং-২৯। খিলজী ও তুঘলকদের শাসনামলে যখন ইসলাম ইউরোপের দিকে প্রসারিত হতে থাকলো জ্ঞানের মশালও তেমনি বাড়তে লাগলো। ইসলামী মর্যাদা ও জ্ঞান-গরিমা যখন দিল্লী হতে হিন্দুস্থানের অন্যান্য এলাকার দিকে অগ্রসর হলো; প্রথমে বাদায়ুনেই তার পদ চিহ্ন রেখেছিল। খাজা নিজামুদ্দীন বাদায়ূনী দেহলভী (র.আ.) ঐ মা‘রফিাতের পরিব্রাজক যিনি দিল্লি ও বাদায়ুনকে এক সুতোয় গ্রন্থিত করেছিলেন। (সূত্রঃ সুলাইমান নদভী, সৈয়্যদ, হায়াত-এ শিবলী-তাযকিরাহ ওয়া সাওয়ানিহ, মাতবাহ মা‘আরিফ, আজমগড়, ভারত; প্রথম প্রকাশ-১৯৪৭খ্রি., পৃ.নং-০৬।

[৩]- ‘ইউসুফজাঈ’ বংশের এই নসবনামা মাওঃ নজীর আহমদ নঈমী ক্বাদিরী সাহেব তার সওয়ানিহ-এ ওমারী গ্রন্থের ২৩ ও ২৪ পৃষ্টায় ছয়টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হতে সংকলন করেছেন। গ্রন্থগুলি হলো- হাকীমুল উম্মাতের সংকলিত এবং সজ্জিত হাশিয়া-এ মাদারিজুন নাবুওয়াত (অপ্রকাশিত) প্রথম খন্ড, তারীখ-এ আফগান, তারীখ-এ খোরশীদ জাহান, জামিউল খাইর, কাসাসুল আম্বিয়া এবং তারীখ-এ ওয়াদি-এ ছেহ্‌ছেহ্, পৃ. নং-১০৫।

[৪]- আব্দুল মালিক ইবনু হিশাম, আবূ মুহাম্মদ, (ওফাত-২১৮হি./৮৩৩খ্রি.), আস-সিরাতুন নাবাবীয়্যাহ, দারু ইবনি হাযম, বৈরুত, লেবানন; দ্বিতীয় প্রকাশ-১৪৩০হি./২০০৯খ্রি., পৃ.নং-০৭; সফিউর রহমান আল-মুবারকপুরী, শাইখ (১৩৬২/১৯৪৩-১৪২৭/২০০৬), আর-রাহীকুল মাখতুম, দারুল ওয়াফা, মিশর; একবিংশ সংস্করণ-১৪৩১হি./২০১০খ্রি., পৃ.নং- ৫৫।

সবকদানঃ

সাধারণত বাচ্চাদের সবকদান ০৪ বছর ০৪ মাস ০৪ দিনের দিন করা হয়। কিন্তু তিনি যখন ০৩ বছর ১১ মাস ০১ দিন বয়সে উপনীত হলেন তখন তাঁর বিসমিল্লাহখানী[১] পারিবারিক রীতিতে ১৩১৮/১৮৯৮ সালে তথাকার এক বড় বুযর্গ আল্লামা আব্দুল ক্বাদির মিঞ্রা (রা.আ)-এর দ্বারা বসন্তের প্রথম গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পতনের শুভমুহুর্তে করা হয়। আল-হামদুলিল্লাহ!

শারীরিক গঠনঃ

হাকীমুল উম্মাত বড়ই মনোহর-সুশ্রী ছিলেন। তিনি ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি উঁচু গড়নের আলতা উজ্বল মনোহর রংবিশিষ্ট লম্বা স্কন্ধ ও কেশবিহীন ভরাট শরীরের অধিকারী ছিলেন। ঘন চুল ও চার আঙ্গুল বিশিষ্ট সুন্নাতী দাড়ি ও খাটো মোচের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মোহনীয় অবয়বের অধিকারী ছিলেন[২]। তিনি না বেশি মোটা ছিলেন, না শুকনো ছিলেন। মধ্যম গড়নের ব্যক্তিত্ববান চেহারার অধিকারী ছিলেন।

শিক্ষাজীবন ঃ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.)-এর শিক্ষাজীবনকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়-

১। উজাহান ২। বদায়ূন শহর ৩। মীভু ৪। মুরাদাবাদ ৫। মীরাঠ[৩]

১। প্রথম পর্যায়- প্রাথমিক শিক্ষা (উজাহান):

জন্মস্থান উজাহানেই মুফতী সাহেব তাঁর সম্মানিত পিতার নিকট কুরআন মাজীদ, প্রাথমিক ধর্মীয় মাসাইল, ফার্সী ও দরসে নেজামীর প্রাথমিক পাঠ পড়েন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআনুল কারীমের নাজেরা শেষ করেন। ১৮৯৯ সালে শুক্রবার দিনে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[৪]

২। দ্বিতীয় পর্যায়- দরসে নেজামীর মাধ্যমিক পর্যায় (বদায়ূন শহর):

মুফতী সাহেব ১৩২৫ হিজরীতে বাদায়ুন শহরের ‘মাদ্রাসা-ই শামসুল উলুম’-এ ভর্তি হন। এখানে তিনি তিন বছর পড়ালেখা করেন। এ সময় তিনি আল্লামা আব্দুল ক্বদীর বখশ বদায়ূনী (র.আ)’র মত মহান দিকপালের ছাত্রত্ব লাভে ধন্য হন[৫]।

---

[১]- ‘বিসমিল্লাহখানী’ মুসলিম শিশুর শিক্ষাজীবন শুরু হওয়ার দিনে পালিত উৎসব। এ উৎসবের আয়োজন সাধারণত শিশুর ৪ বছর ৪ মাস ও ৪ দিন বয়সে করা হয়। ‘বিসমিল্লাহখানী’ অনুষ্ঠান ধর্মীয় শিক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ অনুষ্ঠানে কুরআন শরীফ পাঠ শেখানোর লক্ষে শিশুকে আরবী বর্ণমালা ও কায়দাসহ সিপারা বইয়ের ছবক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের দিন স্থানীয় মসজিদের ইমাম বা বিশিষ্ট আলেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে শিশুকে যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিয়ে ইমামের সম্মুখে বসানো হয়। ইমাম তখন ‘বিসমিল্লাহ’ বলে শিশুকে আরবী বর্ণমালার ছবক দেন। এ সময় তিনি শিশুর হাত ধরে ‘আল্লাহ’ শব্দটি লিখিয়ে থাকেন। পরে তিনি দোয়া-দরূদ পাঠ করেন এবং সকলের জন্য, বিশেষ করে শিশুর জন্য কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করেন। এভাবে অনুষ্ঠান শেষ করে আমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে সামর্থ অনুযায়ী খাবার পরিবেশন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আশীর্বাদের নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন ধরনের উপহার প্রদান করেন। (সুত্রঃ http://bn.banglapedia.org/index.php?title=বিসমিল্লাহখানি.) এর জন্য মূলত কোন সময় বা বয়স নির্ধারিত নেই। বুযর্গগণ ৪ বছর ৪ মাস ও ৪ দিন বয়সে করার কথা বলেছেন। বিশিষ্ট আলিম ও ওলী শাইখ বখতেয়ার খাকী (র.আ) এর সবকদান উক্ত বয়সেই হয়েছিল। (সূত্রঃ মুস্তফা রেযা খাঁন বেরেলভী, মুফতী-এ আজম, মালফুজাত-এ আ'লা হযরত, জা‘মেয়া নেজামিয়া রিজভীয়্যাহ, শেখুপুর, পাঞ্জাব-পাকিস্তান; জুলাই-১৯৯৫ খ্রি./১৪১৫হি., খন্ড-০৪, পৃ.নং-৪৮১। এ ব্যাপারে হাদীছ শরীফে ইরশাদ হচ্ছে- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله- অর্থাৎ- তোমরা‘বাচ্চাদের সর্বপ্রথম “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” তথা কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ শিক্ষা দাও’। (সূত্রঃ আহমদ ইবনু হুসাইন আল-বায়হাকী, আবূ বকর (৩৮৪হি./৯৯৪খ্রি.-৪৫৮হি./১০৬৬খ্রি.), শু‘আবুল ঈমান, প্রকাশনায়- মাজলিসু দাইরাতুল মা‘আরিফ, হায়দারাবাদ, ভারত; ১ম প্রকাশ, ১৩৪৪ হি., অধ্যায়ঃ ফী হুক্কুকিল আওলাদ ওয়াল আহ্লীন, হাদীছ নং-৮৩৭৯।)

[২]- নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১২।

[৩]- আব্দুল মান্নান, মুহাম্মদ, মাওলানা, (অনুবাদক) মিরআতুল মানাজীহ শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ (বাংলা) ভূমিকা/জীবনী, ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী-চট্টগ্রাম, ১২ রবিউল আউয়াল-১৪৩০হি., ২৬ফাল্গুন-১৪১৫বঙ্গাব্দ, ১০মার্চ-২০০৯খ্রি., পৃ.নং-২৪।

[৪]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২৯।

[৫]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১০।

রাতজেগে অধ্যয়ন:

বাদায়ূন শহরের 'মাদ্রাসা-ই শামসুল উলুম'-এ অধ্যয়নকালে হাকীমুল উম্মাত রাত জেগে অধ্যয়ন করতেন। তিনি যে কামরাতে থাকতেন সেখানে আরো অনেক শিক্ষার্থীও থাকতেন। তথায় বেশি শোরগোল হতো। যার কারণে মুফতী সাহেবের পড়া-লেখায় ক্ষতি হতে লাগলো। এর ফলে একবার ঘটলো কি- এক রাতে শিক্ষার্থীরা এতো বেশি শোরগোল করেছিল যে মুফতী সাহেব পড়া তৈরি করতে পারলেন না। সকালে আল্লামা ক্বদীর বখশ (র.আ.)-এর ক্লাসে নাহুমীর নামক কিতাবের সবক পড়তে বসলে প্রবল একাগ্রতা ও সুস্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পরও তিনি পাঠ অনুধাবন করতে পারছিলে না। শিক্ষক আগে পড়িয়ে চলছেন কিন্তু তাঁর শুরুর কিছু পাঠ বুঝে না আসার ফলে আফসোস করছিলেন। এমতাস্থায় মুফতী সাহেব কান্না জুড়ে দিলেন। এই অবস্থা দেখে ওস্তাদ জিজ্ঞেস করলেন, 'আহমদ ইয়ার কী হলো? রাত্রে পাঠ পড়নি আর এখন পড়া বুঝার চেষ্টা করছো'! এরপর ওস্তাদ অযুসহকারে অধ্যয়নে বসতে নির্দেশ দিলেন। নিজ ওস্তাদের কাশফ দেখে তিনি আশ্চার্য হয়ে গেলেন এবং আগামীতে পাঠ অধ্যয়ন কালে অবশ্যই অযুসহকারে বসার দৃঢ় সংকল্প করলেন। পরিশেষে রুমের সকল ঘটনা ওস্তাদ মুহতারামকে সবিস্তারে বললেন। আল্লামা ক্বদীর বখশ (র.আ.) তাৎক্ষণিক মুফতী সাহেবের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর সাথে সিনিয়র ছাত্র আল্লামা আযীয আহমদ বাদায়ূনী (র.আ.)-এর থাকার ব্যবস্থা করলেন। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে মুফতী সাহেবের সকল পেরেশানী দূর হয়ে গেল। শোরগোল হতে পরিত্রাণ পেলেন। আল্লামা আযীয আহমদ বাদায়ূনী (র.আ.)-এর মতো মেধাবী ছাত্রের সহচর্য লভের সুযোগ হলো।

মুফতী আযীয আহমদ বদায়ূনী (র.আ.)-এর বর্ণনা মতে, 'মুফতী আহমদ ইয়ার খান ছাত্রজীবনে নিয়মিত পাঠ পর্যালোচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। রাত জেগে পরদিনের ক্লাশপাঠ শিখতেন। ক্লাশ ছুটির পর সহপাঠীদের নিয়ে ক্লাশে দেয়া সবক তাকরার করতেন। কোনো বিষয় বুঝে না আসলে সাথে সাথে ওস্তাদ হতে তা বুঝে নিতেন। যদি কখনো মুফতী সাহেবের উপস্থাপিত কোনো তথ্য ওস্তাদের মতে ভুল প্রমাণিত হত; তবে সাথীদের নিকট এসে তার ভুল স্বীকার করে নিতেন আর ওস্তাদের মতটিই বলে দিতেন। এ বিষয়ে মুফতী সাহেবের নিজের উক্তি হলো- 'যতক্ষণ না আমি নিজের ভুল স্বীকার করে নিতাম ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মন-মস্তিষ্ক অস্থির হয়ে থাকতো' ।[1]

তিনি এখানে তিনবছর অধ্যয়ন করেন। তাঁর সবক উসূলে ফিক্বাহর কিতাব 'নূরুল আনোয়ার ফী শারহিল মানার' পর্যন্ত গিয়েছিল।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (র.আ.)-এর দরবারে:

বদায়ূনে অধ্যয়নকালে তাঁর ওস্তাদ সদরুল আফাযীল সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.আ.) আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরেলভী (র.আ.)'র কিতাব "عطاء القدير فى أحكام التصوير" তাঁকে পড়তে দিলে তিনি আ'ল হযরতের ইলমী গভীরতার প্রথম স্বাদ পান। ফলে আ'লা হযরতের সাথে তাঁর ঈমানী সম্পর্ক সারা জীবনের রসদ হয়ে গেল।[2] তিনি আ'লা হযরতের দরবারে বালক বয়সেই (১০/১২ বছর বয়সে) হাজির হন। সেখানে তিনি আ'লা হযরতকে দেখে এতই প্রভাবিত হন যে, পরবর্তীতে তিনি তাঁর ছাত্র-খলীফাদের থেকেই মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করেন।[3] মুফতী সাহেব বলেন- "আ'লা হযরতের প্রতি পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধাই আমার জীবনের বড় মূল্যবান মূলধন হয়ে রয়েছে" ।[4] হাকীমুল উম্মাতের

---

[1] - আব্দুন্নবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৬।

[2] - আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২৪ ।

[3] -ঐ, পৃ.নং-০৪ ।

[4] - শারফুদ্দিন মুহাম্মদ, হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৯০ ।

নিজের ভাষ্য হলো- তিনি যখন বেরেলী পৌঁছেন তখন রজব মাসের ২৭ তারিখ ছিল। আ'লা হযরত সে সময় মি'রাজুন্নাবীর মাহফিল বড়ই ধুম-ধাম সহকারে আয়োজন করতেন। দূরদূরান্ত হতে লোকজন এই মাহফিলে অংশ নিতেন। আ'লা হযরত নিজেই সকল আগন্তুকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনার তদারকী করতেন। এই ব্যতিব্যস্ততার জন্য শুধুমাত্র একবার তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়।[১]

৩। তৃতীয় পর্যায় (মীভু):

মুফতী সাহেবের শিক্ষাজীবনের তৃতীয় পর্যায় শুরু আলীগড়ের মীভুতে। তথাকার রাজন্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত 'দারুল উলুম'-এ তিনি তিন/চার বছর লেখাপড়া করেন। মাদ্রাসাটি দেওবন্দী ভাবধারায় পরিচালিত হতো। এখানে তিনি 'মোল্লা হাসান'[২] পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা আক্বীদাগত সুন্নী এবং মাযহাবগত হানাফী ছিলেন। এই মাদরাসার ভাবধারা মুফতী সাহেবের বুর্যগ পিতার পছন্দ না হওয়াতে তিনি ঐ মাদরাসা ত্যাগ করেন।[৩] মুফতী আযীয আহমদের বর্ণনানুসারে- 'এই মাদরাসা তখন দেওবন্দী ভাবধারায় পরিচালিত হতো। এ মাদরাসায়ও মুফতী সাহেব তিন/চার বছর লেখাপড়া করেন (১৩৩৮ হি./১৯১৯ খ্রি. থেকে ১৩৪১ হি./১৯২২ খ্রি. পর্যন্ত) । এর ফলে তিনি দেওবন্দী ভাবধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখা-পড়ার সাথে 'আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান (র.আ.) ও সদরুল আফাযীল সৈয়্যদ নঈমদ্দীন মুরাদাবাদী (র.আ.)-এর অধিকতর জ্ঞান-গভীরতার তুলনামুলক অভিজ্ঞতাও অর্জন করার সুযোগ পান'। খোদ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী সাহেব বলেন- 'আমি দেওবন্দী ওস্তাদদের নিকট একটা বিশেষ সময়সীমা পর্যন্ত লেখা-পড়ার পর একথা বুঝতে পারলাম যে শিক্ষাগত গবেষণার ব্যবস্থাটুকু তাদের আছে বটে কিন্তু ইত্যবসরে সৌভাগ্যক্রমে সদরুল আফাযীল হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমদ্দীন মুরাদাবাদী (কু.সি)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। তখন তিনি আমাকে আ'লা হযরতের লেখা 'আতাআল ক্বাদীর ফী আহকা-মিত তাসভীর' নামক একটা রিসালা (পুস্তক) পাঠ-পর্যালোচনার জন্য দিলেন। তা দেখে আমি অত্যন্ত হতবাক হলাম। এই রিসালা মীভুতে শিক্ষার্জনকালীন থেকে আমার উপর প্রভাব ফেলে এসেছে'।[৪]

৪। চতুর্থ পর্যায় (মুরাদাবাদ):

মীভুর 'দারুল উলুম' দেওবন্দী আদর্শিক হওয়ায় তাঁর এক চাচাতো ভাই আযীয খান সাহেব (যিনি মুরাদাবাদে চাকুরি করতেন এবং সদরুল আফাযীলের মুরীদও ছিলেন) তাঁকে মুরাদাবাদে আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.আ.)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি মুরাদাবাদ পৌঁছে সদরুল আফাযীলের সাথে সাক্ষাত করলেন। সদরুল আফাযীল কতটুকু পড়েছে জানতে চাইলেন। মুফতী সাহেব উত্তর দিলেন (এসময় হাকীমুল উম্মাত দরসে নেজামীর কিতাব সাদরা, শমছে বাজিগা, খিয়ালী, শারহে ছাগমিনী ও অন্যান্য কিতাব ছিল)।[৫] সদরুল আফাযীল পরীক্ষা নিতে চাইলেন। মুফতী সাহেব তৈরি ছিলেন। সদরুল আফাযীল প্রশ্ন করেই গেলেন আর মুফতী সাহেব উত্তর দিয়ে গেলেন। পরিশেষে মুফতী সাহেবও কিছু প্রশ্ন করলেন যার উত্তর শুনে তিনি খুবই প্রশান্তি পেলেন।[৬] সেই সময় সদরুল

---

[১]- আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৭।

[২]- ইলমু মানতিক বা তর্কশাস্ত্রের অন্যতম কিতাব এটি। লিখেছেন- আল্লামা মুহাম্মদ হাসান বিন ক্বাজী গোলাম মুস্তফা (র.আ.)। তিনি ভারতের ফতেহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসাল অজানা। তিনি ১২০৯ হিজরীতে রামপুরে ইন্তেকাল করেন। (সূত্র: হানীফ গাঙ্গোহী, মাওলানা, মুহাম্মদ, জুফরুল মুহাস্সিলীন বি-আহওয়ালিল মুসান্নিফীন, দারুল ইশ'আত, করাচী-পাকিস্তান; মার্চ-২০০০খ্রি., পৃ.নং-২৮৯।)

[৩]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১০; আব্দুল হামীদ, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩০; আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৬-১৮।

[৪]- আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২৪; সূত্র: https://web.facebook.com/281659648964229/photos/মুফতী-আহমদ-ইয়ার-খান-নঈমী-রহঃ-1-বংশ-পরিচয়-2-জন্ম-3-ছাত্রজীবন-4-আলা-হযরত-মুহাম্ম/310098489453678/?_rdc=1&_rdr

[৫]- আব্দুন্নাবী কাউকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৩৯।

[৬]- ঐ, পৃ.নং-১৯।

আফাযীল শিক্ষার্থীদের ‘মুল্লা হাসান’ পড়াচ্ছিলেন। হাকীমুল উম্মাত অনুমতি নিয়ে সেই দরসে বসে পড়লেন। পাঠ মাঝে তিনি এক প্রশ্ন তুলে বললেন, এই জায়গায় মুল্লা হাসান (র.আ)-এর দৃষ্টিভ্রম হয়েছে। সেই সম্পর্কে তিনি তথ্যবহুল আলোচনা করলেন যাতে উপস্থিত শিক্ষার্থীগণ হতবাক হয়ে গেলেন। উত্থাপিত আপত্তির জবাব সদরুল আফাযীল দলীলসহকারে এতো সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় দিলেন যে, আহমদ ইয়ার খান (র.আ.) বিমোহিত হলেন। আলোচনার পর সদরুল আফাযীল বললেন,

‘ভাই মাওলানা! জানার সাথে ‘ইলমের মজা’ (حَلَاوَةُ الْعِلْمِ) থাকলেই ব্যক্তি স্থিরজ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন এবং ‘বক্ষ উন্মোচন’ (شَرْحُ الصُّدُوْرِ)-এর ধনে ধনী হতে পারেন’।

মুফতী সাহেব জানতে চাইলেন, ‘জ্ঞানের মজা’ দ্বারা উদ্দেশ্য কী হযরত?

হযরত উত্তর দিলেন, ‘জ্ঞানের মজা’ তো হুজুর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যাত পাকের সাথে সম্পর্ক রাখার ফলে অর্জিত হয়। এটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না’।

সদরুল আফাযীলের এই কথাগুলো মুফতী সাহেবের মন-মস্তিষ্কে পৌঁছে গভীর অনুভূতির সৃষ্টি করলো।[১] ফলে তিনি এখানে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সদরুল আফাযীল তাকে “জা‘মেয়া নঈমীয়ায়” ভর্তি করে নিলেন।

মুফতী সাহেবের চাহিদা অনুযায়ী যুক্তি ও দর্শন শাস্ত্রের উচ্চ পর্যায়ের পাঠ দান আরম্ভ করলেন। কিন্তু ত্বরীকত, ফতোয়া প্রদান এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে ব্যস্ততার কারণে পাঠদান অনিয়মিত হতে থাকলে একদিন মুফতী সাহেব দরসগাহ হতে বেরিয়ে পড়েন। এই খবর অবগত হওয়া মাত্রই সদরুল আফাযীল তাঁকে পুনরায় মাদরাসায় নিয়ে আসেন। তিনি মুফতী সাহেবের জন্য ইসলামী দর্শনের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম আল্লামা মুশতাক আহমদ মীরাঠী কানপূরী[২] (ওফাত-১৯৬৩খ্রি.)-কে তাঁর ছাত্র সমেত মীরাঠ হতে ‘জা‘মেয়া নঈমীয়ায়’ নিয়ে আসলেন। আল্লামা কানপূরীর সকল ছাত্রদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও নিলেন। শিক্ষক হিসেবে তাঁর বেতন ধার্য করা হয়েছিলো সে সময়ের ৮০ টাকা যা, বিশাল এক ব্যপার ছিল।[৩] এত খরচের কারণ একমাত্র হাকীমুল উম্মাতকে পড়ানো এবং তাঁকে ‘জা‘মেয়া নঈমীয়ায়’ আটকে রাখা।

পঞ্চম পর্যায় (মীরাঠ):

কয়েক বছর পর আল্লামা মুশতাক আহমদ মীরাঠী কানপূরী (র.আ.) মীরাঠের লোকজনের আবেদনের প্রেক্ষিতে যখন মীরাঠ চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন সদরুল আফাযীলের অনুমতিক্রমে সাথে মুফতী সাহেবকেও নিয়ে যান। মিরাঠে মুফতী সাহেব কমবেশী তিন বছর পড়ালেখা করেন। এটা ছিল তাঁর ছাত্রজীবনের শেষ পর্যায়। বুধবার দিনে উনিশ বছর বয়সে (১৩৩২হি./১৯১৩খ্রি.) তিনি দরসে নেজামীর পাঠ সমাপ্ত করেন। সদরুল আফাযীল তাঁকে সনদ প্রদান পূর্বক পাগড়ী পরিয়ে দেন এবং ‘জা‘মেয়া নাঈমীয়া’-এর শিক্ষকতা ও ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করেন।[৪]

মুফতী সাহেব ইসলামী দর্শনে দক্ষতা আল্লামা মুশতাক আহমদ কানপূরী থেকে পেয়েছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অসাধারণ ভালবাসার মত অমূল্য সম্পদ পেয়েছেন সাদরুল আফাযীল আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী থেকে। হযরত সদরুল আফাযীল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে

---

[১]- ঐ।

[২]- তিনি তৎকালীন মর্যাদাবান জ্ঞানী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর বড় ভাই ‘বুলবুল-এ হিন্দ’ মাওলানা নেসার আহমদ কানপূরী উর্দূ ভাষার ‘খতীব-এ আ‘জম’ ছিলেন। প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৭৭।

[৩]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-০৯; আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩০।

[৪]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১১; আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩১।

মুফতী সাহেবকে কিছুটা পাঠদান করেছেন বটে। কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি এবং (হাদীছ পাকের ভাষায়) 'মু'মিনসুলভ অন্তর্দৃষ্টি'[1] মুফতী সাহেবের সমগ্র ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মুফতী সাহেব নিজেই বলতেন- "আমার নিকট যা কিছু আছে সবই সদরুল আফাযীল দান করেছেন"।[2] তিনি আরো বলেন, "পাঠদানের চেয়ে লেখালেখি বেশি কষ্টকর। আমার প্রথম ওস্তাদ (সদরুল আফাযীল) আমাকে শিক্ষক বানিয়েছেন আর দ্বিতীয় ওস্তাদ (আল্লামা মুশতাক আহমদ মিরাঠী) আমাকে লেখক বানিয়েছেন"।[3] তিনি সদরুল আফাযীল আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.আ.)-এর নামের সাথে সম্পৃক্ত করে আপন নামের সাথে "নঈমী" লেখতেন। সদরুল আফাযীল তাঁকে হাদীসের সনদও প্রদান করেন। মুফতী সাহেব তাঁর ছাত্রদেরকে এ সনদই প্রদান করতেন।[4]

হাকীমুল উম্মাতের অর্জিত জ্ঞানের বিষয়:

হাকীমুল উম্মাত নিজ ওস্তাদগণ হতে অর্জিত জ্ঞান শাখা গুলো হল-

১। অনুবাদসহ পবিত্র কুরআনুল কারীম
২। তাজবীদ শাস্ত্র
৩। ফার্সী ব্যাকরণ
৪। ফার্সী সাহিত্য ও তার ইতিহাস
৫। আরবী ছরফ শাস্ত্র
৬। আরবী নাহু শাস্ত্র
৭। ফিক্বাহ শাস্ত্র (আরবী আইন শাস্ত্র)
৮। উসূল-এ ফিক্বাহ শাস্ত্র
৯। মানতিক শাস্ত্র
১০। দর্শন শাস্ত্র
১১। উত্তরাধীকার আইন শাস্ত্র
১২। তাফসীর শাস্ত্র
১৩। উসূল-এ তাফসীর শাস্ত্র
১৪। পবিত্র হাদীছ শাস্ত্র
১৫। উসূল-এ হাদীছ
১৬। রিজাল শাস্ত্র (হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবনী)
১৭। সময় বিজ্ঞান
১৮। দন্ত বিজ্ঞান
১৯। মৃত্তিকা বিজ্ঞান
২০। তর্কশাস্ত্র
২১। ইলমে তাসাউফ
২২। ফাতওয়া প্রদান রীতি
২৩। বিতর্ক বিজ্ঞান
২৪। আক্বীদা শাস্ত্র
২৫। আধ্যাত্মিক জ্ঞান
২৬। আরবী সাহিত্য
২৭। চিকিৎসা বিজ্ঞান
২৮। ইলমু তাবীজ ও আ'মলিয়াত
২৯। অলংকার শাস্ত্র (বালাগাত)
৩০। কবিতা শাস্ত্র

নিজ প্রচেষ্টায় অর্জিত জ্ঞানের বিষয়গুলো হলো-

৩১। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য
৩২। ভূগোল বিজ্ঞান
৩৩। বর্ণশাস্ত্র
৩৪। বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞানিক শাস্ত্র
৩৫। মহাকাশ বিজ্ঞান
৩৬। জীব বিজ্ঞান
৩৭। ইলমে সুলূক (দাওয়াহ বিজ্ঞান)
৩৮। রসায়ন বিজ্ঞান
৩৯। না'ত সাহিত্য
৪০। গণিত শাস্ত্র, যন্ত্রকৌশল ও অন্যান্য (প্রকৌশল বিদ্যা)[5]

---

[1] - হযরত আনাস বিন মালিক (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله- অর্থাৎ- 'তোমরা মু'মিনের অন্তদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাক, কেননা তিনি আল্লাহর নূর দ্বারা (সব কিছু) দেখে থাকেন'। (সূত্র: মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আল-কুরতুবী, আবূ আব্দিল্লাহ (১২১৪খ্রি.-১২৭৩খ্রি./৬৭১হি.), আল-জা'মিউ লি-আহকামিল কুরআন ওয়াল মুবীনু লিমা তাদ্বাম্মানা মিনাস সুন্নাতি ওয়া আহকামিল ফুরক্বান, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, কায়রো-মিশর; ১৩৩৪হি.-১৯৬৪খ্রি., খন্ড-১২, পৃ.নং-১৫৮; মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, আবূ ঈসা (২০৯হি:/৮২৪খ্রি:-২৭৯হি:/৮৯২খ্রি:), আল-জামী' আস-সুনান, দারু ইহ্য়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত-লেবানন; তা.বি., হাদীছ নং-৩১২৭।)

[2] - শারফুদ্দিন মুহাম্মদ হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৯০।

[3] - বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, , পৃ.নং-১৩।

[4] - শারফুদ্দিন মুহাম্মদ হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৯০।

[5] - নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৪।

সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক মন্ডলী:

মুফতী সাহেব অনেক শিক্ষক হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হুজুরের সম্মানিত পিতা আল্লামা মুহাম্মদ ইয়ার খান বাদায়ূনী, মাওলানা আব্দুল ক্বাদির মিঞা বাদায়ূনী, সদরুল আফাযীল আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, আল্লামা মুশতাক আহমদ মীরাঠী কানপূরী, হযরত আল্লামা আশিক ইলাহী, আল্লামা আব্দুল ক্বদীর বখশ বাদায়ূনী, মুফতী আযীয আহমদ বাদায়ূনী, মুফতী আব্দুল আযীয সাহেব, মাওলানা হাফেজ বখশ বাদায়ূনী আলাইহির রাহমাতি ওয়ার রিদওয়ান আজমাঈন প্রমূখ।

দাম্পত্য জীবন:

মুফতী সাহেব **১৯১৯** সালে তাঁর **২৫** তম বসন্তে যুগল জীবনে পর্দাপন করেন। প্রিয় ওস্তাদ আল্লামা আব্দুল ক্বাদির মিঞা বাদায়ূনী (র.আ.) তাঁর বিয়ের খুৎবা দান করেন।[১] বাদায়ূন জেলার শেখুপুরের বিশিষ্ট আফগান ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুল লতীফ খাঁনের কন্যার সাথে মুফতী সাহেবের প্রথম বিবাহ সম্পাদিত হয়। এই মহিলা অত্যন্ত অনুগত, মহৎপ্রাণ, ইবাদতগুজার ও পরহিযগার ছিলেন। তাঁর থেকে অসংখ্য নারী-শিশু পবিত্র কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন। তিনি উঁচু মানে ক্বারীয়্যাহ, শিক্ষিকা ও প্রশিক্ষণদাত্রী ছিলেন। গৃহস্থালী কর্মেও তিনি খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। **১৯৫২** সালে[২] তাঁর ইন্তেকালে হাকীমুল উম্মাত খুবই মর্মাহত হন। তাঁর সকল সন্তান এই খাতুন হতে জন্ম নেন। প্রথম স্ত্রীর ইন্তেকালে তিনি ভেঙ্গে পড়েন। কারণ তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের সফর ও হিযরতের সঙ্গীনী ছিলেন। দ্বিতীয় বিবাহ তিনি **১৯৫৫** সালে কাশ্মীরের গোলটা শরীফের পীর ঘরনার বিধবা কন্যা (যাঁর স্বামী দেশ বিভাগের সময় শহীদ হন) হামীদা বেগম-এর সাথে হয়।[৩] তিনিও অত্যন্ত পরহিযগার, অন্তর উন্মুক্ত খাতুন ছিলেন। **১৯৬৯** সালে তিনি স্বীয় স্বামীর সাথে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। তাঁর ঔরসে কোন সন্তান জন্ম নেয়নি। আগের ঘরের সন্তানদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমরণ তিনি সন্তানদের মায়ের অভাব অনূভূত হতে দেননি। এই মহীয়সী নারীও **১৯৭১** সালে ইন্তেকাল করেন।[৪]

সন্তান-সন্ততি:

হাকীমুল উম্মাতের দুই ছেলে ও পাঁচ কন্যা ছিল। এক কন্যা ছোটবেলাতেই ইন্তেকাল করেন। বড় ছেলের নাম মুস্তফা মিঞা এবং ছোট ছেলের নাম মুহাম্মদ মিঞা ছিল। কিন্তু তাঁরা এনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন না। মুস্তফা মিঞা মুফতী মুখতার আহমদ খান নঈমী আর মুহাম্মদ মিয়া মুফতী ইক্তেদার আহমদ খান নঈমী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ছোট সাহেবজাদা পিতার মতো মহান মুফাস্সির ছিলেন। তাফসীর নঈমী শরীফের বাইশ পারা পর্যন্ত তিনি পিতার নিয়ম-রীতিতে তাফসীর করেন। দুই সাহেবজাদা ইন্তেকাল করেছেন। বড় সাহেবজাদার কোন ছেলে সন্তান ছিলো না। ছোট সাহেবজাদার দুই ছেলে মুফতী আব্দুল ক্বাদির খান নঈমী ও মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক খান নঈমী । বড় সাহেবজাদা পিতার কাছ থেকে সকল প্রকার দরসে নেজামীর পাঠ শিক্ষা গ্রহণ করেন। মুফতী আব্দুল ক্বাদির খান নঈমীর দুই ছেলে- মুহাম্মদ শাহরিয়ার খান নঈমী ও মুহাম্মদ মাসউদুল হাসান খান নঈমী, আর মুহাম্মদ আব্দুর

---

[১]- কাজী আব্দুন্নাবী কাওকাব হাকীমুল উম্মাতের শুভ আক্বদ সদরুল আফাযীল সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.আ.) পড়িয়েছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সাথে এও বলেছেন- তাঁর আক্বদ অনুষ্ঠান ঊজাহান-এ হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তার দেয়া এই তথ্যে ভুল হতে পারে। কেননা আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.আ.) ঊজাহান-এ আসার কোন বর্ণনা হাকীমুল উম্মাতসহ তাঁর জীবনীকারদের কারো লেখায় পাওয়া যায় না। (আল্লাহপাকই ভাল জানেন)। (সূত্রঃ হায়াত-এ সালিক, পৃ.নং-৮৮।)

[২]- হায়াত-এ সালিক নামক কিতাবে প্রথম স্ত্রীর ওফাতের তারিখ ২১মে, ১৯৪৯ সাল উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ।

[৩]- হাকীমুল উম্মাতের প্রথম স্ত্রীর নাম জানা যায়নি। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম তিনি নিজে হামীদা বেগম উল্লেখ করেন। (সূত্রঃ আহমদ ইয়ার খান, মুফতী, সফর নামা, খন্ড-০৩, পৃ.নং-৩২১।)

[৪]- আব্দুল হাকীম শরফ কাদিরী, মুহাম্মদ (১৯৪৪খ্রি.-২০০৭খ্রি.), তাযকিরাহ আকাবীর-এ আহলে সুন্নাত, মাকতাবাহ ক্বাদিরীয়্যাহ, লাহোর-পাকিস্তান; প্রথম প্রকাশ-১৯৭৬খ্রি., পৃ.নং-৫৮; আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩২।

রাজ্জাক খান নঈমীরও দুই ছেলে- হায়দার আলী খান নঈমী ও তৈয়্যব আলী খান নঈমী।[১] আল্লাহপাক হাকীমুল উম্মাতের বংশধরগণকে কিয়াতমত অবধি ইলমে দ্বীনের খাদেম হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

শিক্ষকতা জীবন:

মুফতী আহমদ ইয়ার খান (র.আ.) মুরাদাবাদে তাঁর পীঠস্থান জা'মেয়া নাঈমীয়াতে শিক্ষতা জীবন শুরু করেন। এখানে তিনি এক বছর পাঠদান করে সদরুল আফাযীলের নির্দেশে গুজরাটের দুরাজী এলাকার 'দারুল উলুম মিসকিনীয়্যাহ'তে যোগদান করেন। এখানে তিনি সুদীর্ঘ ০৯ বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করেন। যখন এই মাদরাসার ফান্ড দুর্বল হয়ে পড়ে তখন তিনি দায়িত্ব ছেড়ে নিজভূম বাদায়ূনে চলে আসেন। এই খবর সদরুল আফাযীলের কানে পৌঁছলে তিনি পুনরায় তাঁকে জামেয়া নঈমীয়ার দায়িত্ব প্রদান করেন। একই বছর তিনি ভারতের কাছওয়াছা শরীফে 'দারুল উলুম আশরাফীয়্যাহ'-তে যোগদান করেন। সেখানে তিনি তিন বছর শিক্ষকতা করেন। এখানেই তাঁর বড় সাহেবজাদী জন্মগ্রহণ করেন। পরে কিছু কারণবশত তিনি নিজদেশ পাকিস্তানে চলে যান। এবারও নিজ ওস্তাদ সদরুল আফাযীল আল্লামা সৈয়্যদ আবুল বারকাত (র.আ.) মাধ্যমে গুজরাটের ভীকী জেলার সৈয়্যদ জালালউদ্দীন শাহ-এর 'দারুল উলূম জালালউদ্দীন শাহ'-তে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এখানকার পরিবেশ হুজুরের তেমন পছন্দ হয়নি। তিনি চলে যাওয়ার ইচ্ছাপোষণ করলে পীর আল্লামা সৈয়্যদ মাহমূদ শাহ ইবনে পীর আল্লামা সৈয়্যদ বেলায়েত শাহ আল্লামা সৈয়্যদ আবুল বারকাত (র.আ.) মাধ্যমে আবারও গুজরাট পাকিস্তানের 'দারুল উলুম আনজুমান-এ খোদ্দামুস সূফীয়্যাহ'-তে যোগদানের জন্য রাজী করে নেন। তিনি গুজরাটে কী গেলেন গুজরাটী হয়েই রয়ে গেলেন। 'ইলমুল মিরাস' ছাড়া বাকী সব কিতাব তিনি এখানেই রচনা করেন।[২] গুজরাটের মসজিদ-ই গাউসিয়া (চক, পাকিস্তান)-এ নিয়মিতভাবে দরস প্রদান করে ১৯/২০ বছরে গোটা কুরআন মাজীদ শিক্ষা দেন।[৩] এর পর ১৯৫৩ সালে তিনি 'দারুল উলুম গাউছিয়া নাঈমীয়্যাহ' নামে নিজের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। আজীবন তিনি এখানে পাঠদান করেন। পাঠদান স্থলেই ওফাতের পর তাঁকে দাফন করা হয়।[৪]

পাঠদান পদ্ধতি:

হাকীমুল উম্মাত ছাত্র হিসেবে যেমন উঁচু মাপের ছিলেন তেমনি শিক্ষক হিসেবেও সুদক্ষ ও কৌশলী পাঠদানকারী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের মধ্যে সদরুল আফাযীলের অর্ন্তদৃষ্টি, আল্লামা মুস্তাক আহমদ কানপূরীর যুক্তিবিদ্যার অনুপ্রবেশ, সহজ শব্দ প্রয়োগের অপূর্ব দক্ষতা, তথ্য-তত্ত্বের সময়োচিত সঙ্গম যোগ্যতা এবং অল্প ভাষায় বুঝানোর বিরল গুণের ফলে তাঁর পাঠদান পদ্ধতি অভূতপূর্ব ছিল। 'কাউকে পড়ানোতে হউক বা কোন কিছু জানাতে; সুক্ষ-গুঢ় বিষয়ে খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি'।[৫]

সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র:

হাজার হাজার শিক্ষার্থী হাকীমুল উম্মাতের ছাত্রত্ব লাভ করে ধন্য হয়েছেন। হিন্দুস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে তাঁর অসংখ্য শিষ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীর অনেক সাড়া জাগানো লেখক-গবেষক-বক্তা তাঁর ছাত্র। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন-

---

[১]- ঐ, পৃ.নং-৩১-৩২।

[২]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-০৯-১০।

[৩]- শারফুদ্দিন মুহাম্মদ, হাসান (প্রবন্ধ) পৃ.নং-১৯০।

[৪]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩১ ও ৩২।

[৫]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৮৪।

ভারতে- মাওলানা সৈয়্যদ মুখতার আশরাফ আশরাফী (মুহাম্মদ মিঞা) কাচওয়াছা শরীফ, মাওলানা আলে হাসান সাম্বল মুরাদাবাদী, শাহ মুহাম্মদ আরীফুল্লাহ ক্বাদিরী মীরাঠী, ক্বারী আহমদ হাসান রুস্তগী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন)।

পাকিস্তানে- জনাব সৈয়্যদ মেহমূদ শাহ-গুজরাট, জনাব সৈয়্যদ হামীদ শাহ-গুজরাট, খতীব-এ আহ্‌লে সুন্নাত সৈয়্যদ হামেদ আলী শাহ-গুজরাট, জনাব পীর-এ ত্বরীকত আহমদ শাহ, জনাব সৈয়্যদ আব্দুল গাণী শাহ, হাফিজ সৈয়্যদ আলী শাহ, জনাব সৈয়্যদ মাসউদুল হাসান শাহ-চৌরাহ শরীফ, জনাব সৈয়্যদ আইয়ুব আলী শাহ-চৌরাহ শরীফ, জনাব সৈয়্যদ হামিদ আলী শাহ-চৌরাহ শরীফ, হাফিজ সৈয়্যদ গাণী সাহেব, জনাব সৈয়্যদ ইরশাদ হুসাইন-চৌরাহ শরীফ, জনাব মুফাক্কির-এ আহ্‌লে সুন্নাত ক্বাজী আব্দুন্নাবী কাওকাব-লাহোর, সৈয়্যদ মুহাম্মদ শাহ সাহেব কাড়িয়ানওয়ালা-গুজরাট, জনাব সৈয়্যদ ফাদ্বিল সাহেব নঈমী-গুজরাট, মাস্টার মুহাম্মদ আরেফ সাহেব-গুজরাট, শাইখুল হাদীছ আল্লাম গোলাম আলী উকাড়ভী, চেরাগ-এ আহ্‌লে সুন্নাত হাফিজ বশীর সাহেব-হাফিজাবাদ, শাইখুল কুরআন হাফিজুল হাদীছ সৈয়্যদ জালালুদ্দীন শাহ-ভীকী শরীফ, মুদার্‌রিস-এ আজম মাওলানা মুহাম্মদ নাওয়ায সাহেব-ভীকী শরীফ, পীর-এ ত্বরীকত আল্লামা মুহাম্মদ আসলাম সাহেব নঈমী ক্বাদিরী-মীরাঠিয়া শরীফ, মুফতীয়-এ আজম পাকিস্তান আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ হুসাইন নঈমী-জা'মেয়া নাঈমীয়্যাহ-লাহোর।[১] সাহিবযাদা মুফতী মুখতার আহমদ খান নঈমী, সাহিবযাদা মুফতী ইক্তেদার আহমদ খান নঈমী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আজমাঈন) প্রমূখ।

বাংলাদেশে- ওয়াক্বার-এ মিল্লাত মুফতী আল্লামা ওয়াক্বার উদ্দিন সাহেব (১৩৩৩হি./১৯১৫খ্রি.-১৪১০হি./১৯৮৯খ্রি.) চট্টগ্রাম[২], খতীব-এ বাঙ্গাল আল্লামা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ জালালুদ্দীন চৌধুরী আল-ক্বাদিরী (১৯৪৪খ্রি.-২০১৬খ্রি.)[৩], শের-এ মিল্লাত মুফতীয়-এ আহলে সুন্নাত শাইখুল হাদীছ আল্লামা মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী সাহেব (১৯৪৩খ্রি.-২০২০খ্রি.) চট্টগ্রাম[৪], মাওলানা আব্দুল কারীম সাহেব-

---

[১]- নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৬।

[২]- মৌলভী নজীর আহমদ নঈমী তাঁকে পূর্বপাকিস্তান তথা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের অধিবাসী বলেছেন। অথচ তিনি ভারতের পীলীভেত নামক জায়গায় ১৪ সফর ১৩৩৩ হিজরী মুতাবিক ০১ জানুয়ারি ১৯১৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং 'দারুল উলুম মানজারুল ইসলাম'- বেরেলীতে ইলম অর্জন করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে হিযরত করেন এবং চট্টগ্রাম 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া'-এর অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে তিনি ২২ মার্চ ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে চলে যান। সেখানে 'দারুল উলুম আমজাদীয়্যাহ'-করাচীতে আজীবন তাদরীস-ফাতওয়ার দায়িত্বে থেকে ১৬ রবিউল আউয়াল ১৪১০ হিজরী মুতাবিক ১৮ অক্টোবর ১৯৮৯ সালে ইন্তেকাল করেন। (সূত্রঃ মুহাম্মদ শু'আইব কাদেরী, মাওলানা, ওয়াক্বারুল ফাতাওয়া (উর্দূ) ভূমিকা, বজমে ওয়াক্বারুদ্দীন, করাচী,-পকিস্তান; সফর-১৪২১ হি./মে-২০০০ সাল।)

[৩]- 'খতীব-এ বাঙ্গাল' চট্টগ্রাম 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা'-এ ১৯৭১ সালে মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮১ সালে অধ্যক্ষ পদে আসীন হয়ে একাধিকবার 'শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ'সহ নানা অর্জনে ভূষিত হয়ে ২০১৩ সালে অবসরে যান। কর্মময় জীবনে তিনি সরকারী-বেসরকারী নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হয়ে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'শাহাদাত-ই কারবালা মাহফিল পরিচালনা পরিষদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে আজীবন নেতৃত্ব দিয়ে যান। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে তিনি 'তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত' নামে প্রকাশিত মাসিক ধর্মীয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় ৪৩ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তিনি দেশবিখ্যাত অনেক ছাত্রের সৃষ্টি করেন। সুবিজ্ঞ বিতার্কিক, প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তা এবং উঁচু মানে একজন ইসলামী স্কলার ছিলেন তিনি। এই ব্যক্তি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমের কিছু নির্বাচিত আয়াত নিয়ে তিনি 'দরসে কুরআনে কারীম' নামে দু'খন্ডে বিভক্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচিত শতাধিক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি আমার জালালাইন শরীফ, তিরমিযী শরীফ ও মুসলিম শরীফের শিক্ষক ও পাঠ অনুমতি দানকারী। চট্টগ্রাম-পটিয়া উপজেলার চরখানাই গ্রামের মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি ১৯৪৩ সালের সোমবার জন্ম গ্রহণ করেন। কর্মবীর এই ব্যক্তিত্ব ২৭ সফর ১৪৩৬ হিজরী মুতাবিক ২৫ নভেম্বর ২০১৬ রোজঃ শুক্রাবার দিবাগত রাত ০৭:৩০ টার সময় ঢাকায় 'আ'লা হযরত কনফারেন্স'-এ যোগদান অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেন। হুজুরকে মহান আল্লাহপাক জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন, আমিন!

[৪]- 'শের-এ শিল্লাত' চট্টগ্রাম 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা'-এর শাইখুল হাদীছ ছিলেন। ৪৭ বছরের শিক্ষকতা জীবনে প্রায় সুদীর্ঘ ৩০ বছর বুখারী শরীফের দরস প্রদান করেন। বিজ্ঞ বিতার্কিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তা ছিলেন তিনি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-বাংলাদেশের সুযোগ্য চেয়াম্যান পদে আমৃত্যু আসীন ছিলেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তিনি আরবী-উর্দূ ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করে বিদ্বগ্ধ মহলের প্রশংসা কুড়ান। বাংলাদেশে 'ক্বাদেরিয়া সিরিকোটিয়া' সিলসিলার প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে স্বাধীনতার পক্ষে গণজাগরণে ভূমিকা রাখেন। বাংলা-উর্দূ ভাষায় কিছু রেসালা, প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেন। তন্মেধ্যে অন্যতম হলো- 'দালাইলুল ক্বিয়াম লি মীলাদি খায়রিল আনাম'। তিনি আমার বায়দ্বাবী শরীফ, জালালাইন শরীফ

মুফলতগঞ্জ, মাওলানা লিয়াক্বত হুসাইন সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম, মাওলানা আব্দুল ক্বাদির সাহেব, চট্টগ্রাম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আজমাঈন) প্রমূখ।[১]

নারী শিক্ষায় অবদানঃ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের উপর ফরয"।[২] তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেরশের লোকেরা নারী শিক্ষার বাপারে খুবই উদাসীন ছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে নারীর অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ থাকে। দেশের অর্ধাংশ নারী জনসমাজকে উপেক্ষা করে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র উন্নত হতে পারে না। হাকীমুল উম্মাত এটা ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি নারী শিক্ষার ব্যাপারে খুবই সচেতনতার পরিচয় দেন। তাঁর কন্যা ও পুত্রবধুদের তিনি নিজেই চার বছরে মিশকাত শরীফ, বুখারী শরীফ পরিপূর্ণ শিক্ষা দেন এবং প্রয়োজন মতো নাহু-সরফ ও আরবী ভাষা শেখান। ওয়াজ-তাক্বরীরের পদ্ধতিও তিনি নিজেই শেখান। অন্যান্য নারীদের শিক্ষাদানের জন্য নারীরাই বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে তিনি মনে করতেন।[৩] প্রায় চারশত কন্যা শিশু তাঁর থেকে বুখারী-মিশকাত, আরবী ভাষা, নাহু-ছরফ শিখেছেন।[৪] তাঁর প্রথম স্ত্রী ঘরেই মকতব খুলে শিশু-নারীদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর সন্তানদের প্রথম শিক্ষক তাঁর স্ত্রী একজন নারীই ছিলেন। এটা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পর্দা রক্ষা করে নারী উচ্চশিক্ষায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

বিতর্ক (মুনাযারা)ঃ

হাকীমুল উম্মাত ইসলাম ও আহলে সুন্নাত-এর স্বপক্ষে এর বিরুদ্ধবাদীদের সাথে ০৭টি বিতর্কে লিপ্ত হন। আল-হামদুলিল্লাহ! সকল বিতর্কে তিনি জয় লাভ করে আপন ধর্ম-মাযহাবের শান-মান সমুন্নত করেন।

প্রথম বির্তক তিনি তরুণ বয়সে সদরুল আফাযীলের নির্দেশে ভারতের পীলীভেতে একজন বৃদ্ধ আর্য পন্ডিত রাও ব্রাক্ষ্মচারীর সাথে করেন। এক ঘন্টার বিতর্কে পন্ডিত পরাজিত হয়ে পলায়ন কালে ধৃত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে দস্তখত পূর্বক রক্ষা পায়। এই বিতর্কের খবর সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। পত্রিকা-পুস্তিকায় খবর চাপানো হয়। মুরাদাবাদে বিজয় মিছিল বের হয়। ১৩ জন হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই বিতর্কের কপি এখনো মুরাদাবাদে সদরুল আফাযীলের দরবারে সংরক্ষিত আছে। এমন বিজয়ের ফলে দেওবন্দীরাও তাঁকে তাদের ছাত্র বলে প্রচার করতে থাকে।[৫]

দ্বিতীয় বিতর্ক একজন মাযহাব বিরোধী মৌলভী সানাউল্লাহ অমৃতসরীর সাথে ধনীয়ানগর, অমৃতসর, পাঞ্জাবে 'ইয়া রাসুলাল্লাহ" বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হয়। এতেও ঐ লা-মাযহাবী পরাজিত হয়ে বিতর্কনামায় পরাজয় স্বীকার করে দস্তখত করে রক্ষা পায়।

ও বুখারী শরীফের শিক্ষক ও পাঠ অনুমতি দানকারী। চট্টগ্রাম-আনোয়ারা উপজেলার চাপাতল গ্রামের বুযর্গ মুসলিম ঘরণায় ১৯৪৩ সালে জন্ম। সম্প্রতি ১৪ জ্বিলক্বাদ ১৪৪১ হিজরী মুতাবিক ০৬ জুলাই ২০২০ রোজঃ সোমবার আসরের সময় ইন্তেকাল করেন। আল্লাহপাক হুজুরের কবরকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করুন, আমিন!

[১]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, , পৃ.নং-২১-২২।

[২]- মুহাম্মদ ইবনু মাযাহ আল-ক্বাযভীনী, আবূ আব্দিল্লাহ (২০৯হি./৮২৪খ্রি.-২৭৩হি./৮৮৬খ্রি.), আস-সুনান, প্রকাশনায়- দারুল ফিকির, বৈরুত-লেবানন; তাবি, খন্ড-০১, পৃ.নং-২৮; হাদীছ নং-২২৪; আহমদ ইবনু হুসাইন আল-বায়হাক্বী, আবূ বকর (৩৮৪হি./৯৯৪খ্রি.-৪৫৮হি./১০৬৬খ্রি.), শু'আবুল ঈমান, প্রকাশনায়- মাজলিসু দাইরাতুল মা'আরিফ, হয়দারাবাদ-ভারত; ১ম প্রকাশ, ১৩৪৪ হি., খন্ড-০২, পৃ.নং-২৫৪, হাদীছ নং-১৬৬৬; সুলাইমান ইবনু আহমদ আত-তাবরানী, আবুল ক্বাসিম (২৬০হি./৮২১খ্রি.-৩৬০হি./৯১৮খ্রি.), আল-মু'জাম আল-কাবীর, প্রকাশনায়-মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মৌসুল-ইরাক; ২য় প্রকাশ, ১৪০৪হি./১৯৮৩খ্রি., খন্ড-১০, পৃ.নং-২৪০, হাদীছ নং-১০৪৩৯।

[৩]- আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৯১ ও ৯২।

[৪]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩৫।

[৫]- নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৮; আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৮৪।

তৃতীয় বিতর্ক এক মির্যায়ী তথা ক্বাদিয়ানী মতবাদী খাদিম চিমা উকিল-এর সাথে গুজরাটে ‘খাতমে নাবুয়াত’ বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্কের প্রতিক্রিয়ায় আনেক কাদিয়ানী তাওবাহ করে মুসলমান হয়ে যায় এবং ঐ বিতর্কে উপস্থিত অনেক লোক হাকীমুল উম্মাতের হাতে বায়‘আত হয়ে যান।

চতূর্থ বিতর্ক দেওবন্দী সূফী আব্দুর রহমান দেওবন্দীর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গুজরাটে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঐ দেওবন্দী পরাজিত হয়ে তার দল ত্যাগ করে এবং তিন বছর পর্যন্ত সুন্নী মতধারার জীবন অতিবাহিত করে। পরে দেওবন্দী মতবাদে ফিরে যায়।

পঞ্চম বিতর্ক দেওবন্দী সূফী আব্দুর রহমান দেওবন্দীর ছাত্র কালোরী দরাজা-গুজরাটের খতীব মৌলভী এনায়েতুল্লাহ বুখারীর সাথে গুজরাটে লালা ফদল পাগানেওয়ালার বাড়িতে সকাল হতে সন্ধ্যা অবধি দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্কের পর মৌলভী বুখারী তাওবাহ করে স্বীকার করে নেন যে, দেওবন্দী আক্বীদা ভ্রান্ত এবং বেরেলভী আক্বীদা বিশুদ্ধ। তার দস্তখতসহ এই মহাবিজয় বার্তা ‘ঝগড়ে কা খাতিমা’ (ঝগড়ার পরিসমাপ্তি) শিরোনামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। মৌলভী এনায়েতুল্লাহ সাহেবকে তার সম্মতিতে সুন্নী অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়। তিনি প্রায় ১৫ বছর এই আক্বীদাতে স্থির ছিলেন। পরে আবার দেওবন্দী দলে চলে যায় এবং প্রচার করতে থাকে যে, বিতর্কের সময় আমি কম জ্ঞানী ছিলাম বিধায় পরাজিত হয়েছি।

ষষ্ঠ বিতর্কও দেওবন্দী মৌলভী গুলাম খানের সাথে চাকওয়াল জেলার পিন্ডিগেপ নামক স্থানে জানাযার পর মৃতের জন্য দো‘আ করা জায়িজ-নাজায়িজ বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতেও মৌলভী গুলাম খান দেওবন্দী পরাজিত হয়ে নিজের হার মেনে নেয় এবং যথারীতি দস্তখত পূর্বক মুক্তি পায়।

সপ্তম এবং শেষ বিতর্ক একজন শীয়া মৌলভীর সাথে শিয়ালকোটে অনুষ্ঠিত হয়। এতেও ঐ শীয়া মৌলভী পরাজিত হয়ে নিজের হার মেনে নেয় এবং যথারীতি দস্তখত পূর্বক মুক্তি পায়।

এছাড়া আরেকটি অসম্পূর্ণ বিতর্ক মৌলভী আহমদ দ্বীন গোখড়ভীর সাথে হাযির-নাযির বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মৌলভীর প্রথম আপত্তি ‘নবীজি কি দোযখেও উপস্থিত থাকেন? (নাউযুবিল্লাহ!) এমন প্রশ্নের সাথে সাথে জনতার হাতে গণধোলাই খেতে থাকলে এক পর্যায়ে বলে উঠে- ‘গাউসে পাকের জন্য হলেও আমাকে ছেড়ে দাও’! পরে সে চলে যায় এবং বিতর্ক অসম্পূর্ণ থেকে যায়।[১]

হাকীমুল উম্মাত সকল বিতর্কে (আল-হামদুলিল্লাহ!) বিজয়ী হয়ে পরাজিতদের কাছ থেকে সই-স্বাক্ষরসহ পরাজয়নামা গ্রহণ করেন।[২]

ওয়াফাতকালীন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাঃ

হাকীমুল উম্মাতের ওয়াফাতকালীন সময় (২৪ অক্টোবর-১৯৭১) পাকিস্তানের জন্য খুবই নাজুক পরিস্থিতির ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। হাকীমুল উম্মাত এটা নিয়ে খুবই পেরেশান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ১ মাস ২২ দিন পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। সাথে সাথে ওলামা-আওয়াম দুনিয়ার প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়তেছে দেখে তিনি হতাশা প্রকাশ করতে থাকেন। লাহোর হাসপাতালে তাঁর ছাত্র কাজী আব্দুন্নাবী কাওকাব-এর সাথে কথপোকথন এর এক পর্যায়ে বলেন, ‘মূর্খ ও অজ্ঞ বক্তাগণ জাতির মধ্যে তামাশা করছে। আজ আমাদের আলোচনায় জ্ঞানগত সারগর্ভ নির্দেশনা বহু দূরে চলে গেছে। সোজাসুজি ভাষায় আয়াত বা হাদীস-এর অর্থ বর্ণনা করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। কিস্সা-কাহিনী, কবিতা-লতিফার প্রতি মানুষের ঝোঁক বেড়ে গেছে।

---

[১]- আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৩৫।

[২]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৮৪-১৯০; নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৮-২০।

মানুষ ইংরেজি সংস্কৃতির প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ছে। খ্রিষ্টানদের মতো সিন্দুকে ভরে কবর দেয়া হচ্ছে। যার-তার কবর পাকা ও উঁচু করা হচ্ছে। বিয়ে-খৎনা, ঈদ-শবে বরাত, মহরম-নতুন ফ্যাশন ইত্যাদিতে মানুষ নানারকম অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ইসলামকে কলুষিত করছে'।[১] মন্দ রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে তিনি 'ইসলামী যিন্দেগী' নামে গ্রন্থ রচনা করে ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সুন্নাতী সংস্কৃতির সুপ্রভাব এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির মন্দ প্রভাব সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করেন। সুন্নীদের ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও পীরদের মাযার পরিচালনার সমালোচানা করে বলেন,

اہل سنت بہر قوالی و عرس * دیوبندی بہر تصنیفات و درس-

خرچ سنی بر قبور و خانقاہ * خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ!

সুন্নীরা আজ পড়ে আছে নিয়ে কাওয়ালী-ওরস,

দেওবন্দীরা রত আছে নিয়ে লেখালেখি-দরস।

সুন্নীরা সব মাল উড়ায়ে বানায় কবর-খানেক্বা,

নজদীরা করে জ্ঞান চর্চা, আর বানায় দরসগা'।[২]

মুসলিম জাতির অধঃপতনে তিনি খুবই ব্যথিত ছিলেন। মহাকবি আল্লামা ড. ইকবাল (১৮৭৭খ্রি.-১৯৩৮খ্রি.)-এর মতো তিনিও আপন জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েন।

দৈনন্দিন পছন্দনীয় কর্ম:

নিয়মিত তিনি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন এবং হাদীছ শরীফ পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, 'কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা রুহানী শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দরসে হাদীসের দ্বারা কাশফের শক্তি বৃদ্ধি পায়'। এছাড়া নিয়মিত সূফীতাত্ত্বিক কিতাব পড়তেন। বিশেষত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (র.আ.)-এর কিতাব বেশি পাঠ করতেন।[৩] ঘর হতে মাদরাসায় যেতে আসতে অবশ্যই সালাম দিতেন। বাচ্চা-শিক্ষার্থী এবং মুরীদদেরও এর যথাযথ পালনে অভ্যস্ত করতেন।[৪] তিনি সময়কে অত্যন্ত মূল্যায়ন করতেন। লোকজন তাঁকে দেখে সময় মিলাতেন। তিনি জামা'আত সহকারে নামায আদায় করতেন। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে চেনা লোকজন সাক্ষী দিয়েছেন যে, আমরা তাঁকে কখনো 'তাকবীর-এ উলা' ছাড়া নামায আদায় করতে দেখিনি। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর আধাঘন্টা কুরআনের তাফসীর এবং পনের মিনিট হাদীছ পাকের দরস দিতেন। এই দরসে দূর-দূরান্তের লোকজন অংশ নিতেন। এই দরসের জ্ঞান প্রশস্ততা এতবেশী ছিলো যে, এক বার শেষ করতেই চল্লিশ বছর লেগেছিল। দ্বিতীয়বার শুরু করলে এগারো পারা পর্যন্ত পৌঁছেই ইন্তেকাল করেন। এরপর ছয় রাকাত ইশরাক্ব নামায পড়ে সকালের নাস্তা সারতেন। নাস্তার পর ছাত্রদের পড়াতেন। এর পর দুই ঘন্টা লেখালেখি করতেন। পাঠদান শেষ করে দুপুরের খাবার খেয়ে একঘন্টা বিশ্রাম নিতেন। বিশ্রাম শেষে জোহরের নামায আদায় করে একপারা কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আসরের আগ পর্যন্ত আবার লেখালেখি, ফতোয়ার জওয়াব দান এবং সাক্ষাত প্রার্থীদের সাথে কথা বলতেন। লেখালেখির সময় তিনি কারো সাথে কথা

---

[১]- আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৪৭।

[২]- আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, দীওয়ান-এ সালিক, নঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার-লাহোর; তারিখ বিহীন, পৃ.নং-৪৫।

[৩]- নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১২।

[৪]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, , পৃ.নং-১৮৩।

বলা বা সাক্ষাত প্রদান করতেন না। এ সময় তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতো।[1] আসর আদায় করে তিন মাইল পর্যন্ত এক বুযর্গের দরবার পর্যন্ত পদব্রজে ‘দরুদ-এ তাজ শরীফ’[2] পাঠ করতে করতে যেতেন; ফেরার সময় ‘দালাইলুল খায়রাত’[3] পাঠ করতে করতে মাগরিবের আযানের আগেই মসজিদে ফিরে আসতেন। মাগরিবের নামায আদায় করে খাবার খেয়ে ছাত্রদের পাঠদানের জন্য গবেষণা করতেন। এশার নামায আদায় করে ছাত্রদের সাথে এগারো মিনিট ফিক্বহের মাসআলা-মাসাইল আলোচনা শেষে ঘুমুতে যেতেন। শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ, নফল নামায এবং বিতরের নামায পড়ে মুরাক্বাবা (আধ্যাত্মিক ধ্যান) করতেন। অতঃপর একঘন্টা বিশ্রাম করতেন। বিশ্রাম শেষে মসজিদে ফজরের জামা‘আত আদায় করতেন। প্রত্যেক জামা‘আতে নিজের দুই ছেলেকে নিয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, “প্রত্যেক নামাযের সময় মুসলমানের ঘর যেন চাল-চলনে, আলোকধারায়, কুরআন তেলাওয়াতের গুঞ্জরণে এবং নামাযের প্রস্তুতির উৎসবে মেতে উঠে। যে ঘর এরূপ হবে না তা কবরস্থানের মত। বিয়ে-শাদীর আনন্দ, ঈদের খুশি, খেল-তামাশার উৎসব এবং দেশজ সাংস্কৃতিক আয়োজন কাফিররাও করে থাকে। মু’মিনের সব ঈদ-আনন্দ-উৎসব তো নামায। কাফির ও মু’মিনের মাঝে এটাই হলো মৌলিক পার্থক্য’। তিনি চাইতেন- সকল মু’মিনের ঘরে যেন এশা-ফজরের নামাযের প্রস্তুতির জন্য আলোকধারা বয়ে যায়। অযুর জন্য শোরগোল হউক। আযান শুনার জন্য যেন সবাই নিরব হয়ে যায়”।[4]

পোশাক-পরিচ্ছেদ:

হাকীমুল উম্মাত খুবই সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। প্রায় সময় সাদা পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। সাদা বা বেগুনী রংয়ের পাগড়ী পরতেন। সুগন্ধির মধ্যে গোলাপ ও চন্দনের গন্ধ বেশী ভালোবাসতেন। কাপড়ের মধ্যে অধিকাংশ সময় পাঞ্জাবী-পাজামা পরিধান করতেন। কখনো বা আসকীন-শেরওয়ানী পরতেন। বেশিভাগ সময় মাথায় টুপি পরিধান করতেন।[5] তাঁর কাপড় মধ্যম মানের সাদাসিধে ছিল। কলিদার জামা, কুর্তা, সেলাওয়ার এবং পাজামা সবই পরিধান করতেন। এতই নরমাল জীবনাচার ছিল

---

[1]- মাওলানা নজীর আহমদ নঈমী (হাকীমুল উম্মাতের ছাত্র ও জীবনীকার) বলেন, হাকীমুল উম্মাত’র এক মুরীদ ডা. আনসারী সাহেব ঢাকা হতে প্রথম যখন গুজরাট,-পাকিস্তানে মুর্শীদের সাক্ষাতে আসেন তখন হুজুর দরসগাহে লেখালেখিতে ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে ধ্যানই দেননি। ডা. সাহেব ব্যাগসহ দরজার মুখ বরাবর হয়রান হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তাকে চিনতাম না। কিন্তু ব্যাগসমেত দেখে বুঝলাম দূরের কোন মুসাফির হবেন তিনি। কিছুক্ষণ পর আমাদের এক বন্ধু উঠে জানতে চাইলেন, আপনি কোত্থেকে এসেছেন এবং কার সাক্ষাতে আসলেন? উত্তরে ডা. সাহেব বললেন, আমি মুর্শীদ কিবলা হযরত হাকীমুল উম্মাতের সাথে দেখা করতে এসেছি। প্রশ্নকারী হুজুরকে দেখিয়ে বললেন, উনি তো হাকীমুল উম্মাত, তাঁকে আপনি চেনেন না? আমাদের কথপোকথন শুনে হাকীমুল উম্মাত মাথা উঠালেন, উঠে দরজায় তশরীফ আনলেন এবং তাঁরা একে অপরকে চিনলেন। সাথে করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। পরে আমি ডা. সাহেব হতে জানতে চাইলাম- আপনি হুজুরকে চেনেননি কেন? অথচ আপনার কথা মতো পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সাথে আপনার কয়েকবার সাক্ষাত হয়েছিল; এমনকি তিনি আপনার ঘরে মেহমানও হয়েছিলেন! তথায় আপনি হুজুরের হাতে বায়‘আতও হয়েছিলেন। প্রতিউত্তরে ডা. সাহেব বললেন, ‘যখন আমি দরজার সামনে আসি তখন আমি হুজুরকে ঐ জায়গায় বসা দেখিনি। বরং ঐ জায়গায় আমি তীব্র সবুজ রংয়ের আলো দেখেছি। হয়রান হয়ে ভাবতে লাগলাম- দিনের তৃতীয় প্রহরে শুধুমাত্র এই জায়গায় কেন সবুজ আলো! আর এই আলো কীভাবে বা আসলো? এই আলো হুজুরকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। যখন তিনি আমার দিকে ফিরে তাকান তখন ঐ আলো নিজে অদৃশ্য হয়ে যায় আর আমি হুজুরকে দেখতে পাই’। ডা. সাহেব নিজে এই আলো সম্পর্কে হাকীমুল উম্মাত হতে জানতে চাইলে তিনি মুচকি হাসি দিয়ে বলেন, আমি কি জানি? এটা তো আপনি দেখেছেন, আমি তো দেখিনি! (সুবহানাল্লাহ!)। নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩২ ও ৩৩।

[2]- অত্যন্ত বরকতময় ও ফযিলত পূর্ণ দরুদ শরীফ। লিখেছেন ইয়ামেনের হাদ্বারামাউত অঞ্চলের তারীমে জন্মগ্রহণকারী বিশিষ্ট ফক্বীহ, সমাজসংস্কারক, শাইখ সৈয়্যদ আবূ বকর বিন সালিম আল-ইয়ামানী (৯১৯হি.-৯৯৩হি.)। তিনি ২৩ জুমাদাল উলা ৯১৯ হিজরীতে জন্ম এবং রবিবার রাত্রে ২৭ জিলক্বদ ৯৯৩ হিজরীতে আইনা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। আইনা নামক স্থানে তাঁর কারুকার্যমন্ডিত গুম্বুজ বিশিষ্ট মাযার সর্বক্ষণ জেয়ারতে সরগরম থাকে। (সূত্রঃ https://ar.wikipedia.org/wiki/ أبو_بكر_بن_سالم)

[3]- দরুর শরীফের অন্যতম বিশ্বজনীন কিতাব। সপ্তাহের দিনসমূহে পড়ার জন্য সাত অংশে বিভক্ত দরুদ শরীফ সম্বলিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। লিখেছেন শাযালিয়া ত্বরীকার অন্যতম ইমাম আল্লামা আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন সুলাইমান আস-শামলালী আল-হাসানী আশ-শাযালী (৮০৭হি./১৪০৪খ্রি.-৮৭০হি./১৪৬৫খ্রি.)। তিনি বংশগত আরবী ছিলেন। মরক্কোর সর্বশ্রেষ্ঠ সাতজন আলেমের মধ্যে তিনি অন্যতম। মরক্কোতেই তাঁর মাযার শরীফ রয়েছে। (সূত্রঃ https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_بن_سليمان_الجزولي)

[4]- নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২৪-২৫।

[5]- ঐ, পৃ.নং-১২।

যে, শিক্ষার্থী বা ভক্তগণের মাঝে উপবেশনরত থাকাবস্থায় অপরিচিত কেউ আসলে চেনা মুশকিল হয়ে যেত। পাঠদান বা ওয়াজের জন্য দূরে কোথাও গেলে আয়োজক-অভ্যর্থনাকারীদের অধিকাংশ সময় জিজ্ঞেস করতে হতো- মুফতী সাহেব কে?[১]

খাবার:

মুফতী-এ ইসলাম আল্লামা আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (র.আ.) সকালের নাস্তাতে গমের রুটি, কাশ্মীরী সবজী, এলাচ চা পছন্দ করতেন। দুপুরে আলু-গোস্ত; বিশেষত ছাগলের পেছনের রানের গোস্ত পছন্দ করতেন। পোলাও, ফিরনী, কদু, লাউও পছন্দ করতেন। মিষ্টান্নের মধ্যে কালোজামুন, সান হালুয়া, বাদায়ূনে তৈরি পিঠা এবং ফলের মধ্যে আম বেশি পছন্দ করতেন। এশার নামাযের পর একপোয়া মহিষের দুধ পান করতেন। খাবারে প্রায় সময় দুইটি রুটি, আদার পানি, মূলা এবং শসা অবশ্যই থাকতো। পরিমাণ মতোই নিয়মিত আহার করতেন। কেউ বেশি দিলেও খেতেন না। খাবারের আগে গোসল করলেও অবশ্যই হাত ধৌত করতেন। সবসময় হাতেই খাবার খেতেন। চা-দুধ পানে চামচ ব্যবহার করতেন। চাটাইয়ে বসে আহার করতেন। চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া জায়েজ মনে করতেন। খাবার যাই তিনি গ্রহণ করতেন তা চেটেপুটে খেতেন। বাচ্চাদের বড় এক প্লেটে বসিয়ে খাওয়াতেন। ধীরে-সুস্থে খবার খেতেন। খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বড় আওয়াজে পড়তেন। তাঁর সাথে খাবার গ্রহণকারী সবার হাত ধোয়া এবং বড় আওয়াজে 'বিসমিল্লাহ' পড়া আবশ্যক ছিল। তিনবেলার চেয়ে বেশি খেতেন না।[২]

হজ্জ্ব ও যিয়ারত:

মু'মিনের ইবাদতের ক্বিবলা মক্কা শরীফ এবং ক্বলবের ক্বিবলা মাদীনা শরীফে তাঁর অনেকবার হাযির হওয়ার সুযোগ নসীব হয়। তিনি সাতবার হজ্জ্বব্রত ও তদসঙ্গে পঁচিশবার ওমরাহ পালন করেন। সর্বপ্রথম ২৭ বছর বয়সে ১৩৫০ হিজরী মুতাবিক ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম হজ্জ্বপালন করেন। এর পর ১৩৬৫ হিজরীতে তাঁর মহীয়সী আম্মাজানসহ হজ্জ্ব পালন করেন। এই সফরে মাদীনা শরীফে রওজা মুবারকের সামনে একদিন তাঁর আম্মীজানকে নিয়ে বসাবস্থায় মায়ের পায়ে হাত রেখে আরজ করলেন, 'আমি পুরো জীবন আপনার থেকে দূর বিদেশে থেকেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য দো'আ করুন! তখন তাঁর আম্মিজান সোনালী জালির নিকটে গিয়ে রওজা মুবারকের দিকে সামনাসামনি কথা বলার মতো করে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার ছেলের কোন ভাই নেই। সে একা। আপনি তার পিঠের উপর রহমতের হাত রাখুন'![৩] মায়ের এই দো'আর বদৌলতে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রহমতের ছায়া তাঁর শিরোপরে আজীবন দয়া বর্ষন করেছে। এছাড়া ১৯৫৪ সালে তিনি প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে হজ্জ্ব করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে হজ্জ্বে গমন করে তিনি একবছর মাদীনা মুনাওয়ারাহতে অবস্থান করেন এবং ১৯৫৭ সালে আবার হজ্জ্ব করে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৬০ সালে তিনি স্বীয় পিতার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ্ব আদায় করেন এবং ১৯৬৯ সালে শেষবার হজ্জ্বব্রত পালন করেন। এই সফরে তিনি মা আমীনা বিনতে ওয়াহ্হাব (রা.)-এর নামে ওমরাহ আদায় করেন। শেষ সফরে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হামীদা বেগমও সাথে ছিলেন।[৪]

---

[১]- https://web.facebook.com/133053647537579/posts/152928535550090/?_rdc=1&_rdr

[২]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৮৩।

[৩]- আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং- ১৫৭ ও ১৫৮।

[৪]- কিন্তু মাওলানা নজীর আহমদ নঈমী বাদায়ূনী শুধুমাত্র দুইবার হজ্জ্বের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম হজ্জ্ব ৪৩ বছর বয়সে ১৯৩৭ সালে এবং দ্বিতীয় হজ্জ্ব ১৯৫৩ সালে সমুদ্র পথে মুম্বাই হয়ে জিদ্দা সমুদ্র বন্দরে পৌঁছে। নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৩; আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩৫-৩৬।

দেশভ্রমণঃ

ভ্রমণ জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে। আল্লাহপাক বলেন, “আমি তাদের এবং সেসব জনপদের অধিবাসী, যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম; সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম এবং তথায় ভ্রমণ নির্ধারিত করেছিলাম (যাতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতে পারে)। তোমরা এসব জনপদে রাত্রে এবং দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর! অতঃপর তারা বলল, হে আমাদের প্রভূ! আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দিন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি জুলুম করেছিল। ফলে, আমি তাদের উপাখ্যানে পরিণত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞের জন্য শিক্ষা রয়েছে”।[১] ‘ভ্রমণের দ্বারা মানুষের মনোদৈহিক প্রফুল্লতার সাথে সাথে মানব মনের অনুসন্ধিৎসু বন্ধ জানালা খুলে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় ধরা দেয় মনের আয়নায়। জগতে সৃষ্ট নানাবিধ শ্রেণির ভূত-বর্তমান বাস্তবতা ও অবস্থা দেখে ও শুনে ভ্রমণকারী বিবেকবানগণ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করার সাথে সাথে তা আপন জাতি-গোষ্ঠির সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন; যাতে জাতি সতর্ক হয় এবং শিক্ষা গ্রহণ করে’।[২] হাকীমুল উম্মাতও জীবদ্দশায় বহুদেশ ও পবিত্র স্থান ভ্রমণ করেছেন। বাংলাদেশ, হিজাজ-মক্কা শরীফ-মাদীনা শরীফ, ওমান, জর্ডান, ফিলিস্তিন-বায়তুল মুকাদ্দাস, বেথেলহেম, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, কুয়েত প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। সফরে তিনি হাত ঘড়ি, পকেট ঘড়ি, ছোট গোল চিরুনী, ছোট চাকু, কাঁচি, মিসওয়াক, কলম-পেন্সিল, নেইল কাটার, ছোট মগ, আতরের শিশি, মাদীনা শরীফের কিছু এলাচি, নামাযের জন্য ছোট-বড় জায়নামায এবং অযুর জন্য লোটা সঙ্গে নিতেন।[৩]

বাইআ‘ত ও খিলাফতঃ

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি আপন ওস্তাদ সদরুল আফাযীল আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.আ.) নিকট বায়আত গ্রহণ করেন এবং তার থেকেই খিলাফত লাভ করেন। সদরুল আফাযীল ভারতের কাছওয়াছা শরীফের জনাব শাইখ সৈয়্যদ মুহাম্মদ গুল আশরাফী (র.আ.)-এর মুরীদ ছিলেন। তাঁর সিলসিলা ক্বাদেরীয়া তরীকাভূক্ত ভারতের কাছওয়াছা শরীফের সিলসিলায়ে খানদান-এ আলীয়া আশরাফীয়ার সাথে মিলে হযরত সৈয়্যদুনা শাইখ আব্দুল ক্বাদির জিলানী (র.আ.) (৪৭০হি./১০৭৮খ্রি.-৫৬১হি./১১৬৬খ্রি.) পর্যন্ত পৌঁছে।[৪] এজন্য তিনি তাঁর নামের শেষে ‘আশরাফী’ লিখতেন। ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে তাঁর অনেক মুরীদ ছিল। তিনি যেখানেই যেতেন লোকজন তাঁর হাতে বায়‘আত হওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

ইসলামী কোর্ট স্থাপনঃ

মুফতী-এ আজম আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (র.আ.) তাঁর কর্মস্থল ভারতের মুরাদাবাদ, দুরাজী এবং কাছওয়াছা শরীফে এবং পাকিস্তানের গুজরাটে ইসলামী কোর্টের আদলে ‘দারুল ইফতা’ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জা‘মেয়া নাঈমীয়্যাহ-মুরাদাবাদে ১৯১৩-১৯১৪ সাল পর্যন্ত, দারুল উলুম মিসকিনীয়্যাহ, দুরাজী-ভারতে ১৯১৪-১৯২৩ সাল অবধি, দ্বিতীয় দফায় জা‘মেয়া নাঈমীয়্যাহ-মুরাদাবাদে ১৯২৩-১৯২৪ সাল পর্যন্ত, জা‘মেয়া আশরাফীয়্যাহ-কাচওয়াছা শরীফে ১৯২৪-১৯২৭ সাল পর্যন্ত এবং গুজরাট-পাকিস্তানে নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা দারুল উলুম গাউছিয়া নাঈমীয়্যাহতে ১৯২৭-

---

[১]- আল-কুরআনুল কারীম, ৩৪:১৮,১৯।

[২]- মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (জন্ম-১৯৮৮খ্রি.), সফরের ইসলামী বিধান, মেহবার পাবলিকেশন, ঢাকা-১০০০; প্রথম প্রকাশ- শাবান-১৪৪৩৮হি./মে-২০১৭খ্রি., পৃ.নং-১১।

[৩]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং- ১৬।

[৪]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৫৮।

১৯৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় চুয়াল্লিশ বছর সমকালীন বিভিন্ন ইসলামী সমস্যার সমাধান প্রদান করেন। তাঁর এই মহান কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্য হতে বাছাই করে প্রায় চল্লিশজন ছাত্রকে 'মুফতী আজম'-এর কোর্স করিয়ে সনদ প্রদান পূর্বক ফাতওয়া ও ইসলামী সমস্যাসমূহের সমাধান দানের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি ১৯৫৭ সাল থেকে ফাতওয়া প্রদান করা হতে অবসর নেন। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বড় সাহেবজাদা মুফতী মুখতার আহমদ খান নঈমী সাহেবকে প্রদান করলে তিনি ওয়াজ-নসীহতে ব্যস্ততার দরুণ এই মহান দায়িত্ব যথাযথ আদায়ে অপারগ হলে ছোট সাহেবজাদা আল্লামা মুফতী ইক্তেদার আহমদ খান নঈমী সাহেবকে প্রদান করেন।[১] ছোট সাহেবজাদা পিতার মান রক্ষা করেন। তিনি আজীবন পিতৃপ্রদত্ত এই গুরু দায়িত্ব উপযুক্ত উত্তরাধীকারীর মত আদায় করেন। পিতার নির্দেশক্রমে তাঁর এই প্রদত্ত ফাতওয়া আজ ছয় খন্ডের বিশাল 'আল-আতায়া আল-আহমদিয়্যাহ ফী ফাতাওয়া নাঈমীয়্যাহ'[২] নামে প্রকাশিত হয়ে উম্মতে মুসলিমার তৃঞ্চা নিবারণ করে চলেছে।

ওফাত:

হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) শেষ বয়সে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবনের কিছু সময় লাহোর হাসপাতালে কাটাতে হয়। শরীরে বড়ধরণের একটি অপারেশনও করা হয়। ১৪ অক্টোবর সোমবার-১৯৭১ সালে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর সার্বক্ষনিক কামনা ছিল তিনি শেষ সময়ে যেন হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা মুবারক দেখে দেখে দুনিয়া হতে যেতে পারেন।

"آپ کے ہو کر جییں ہم * نام نامی پہ مریں ہم

جب قیامت میں اٹھیں ہم * عرض اس طرح کریں ہم-

عرض ہے سالک کی آقا * جانکنی کا ہو یہ نقشہ

سامنے ہو پاک روضہ * اور لبوں پر ہو یہ کلمہ"-

আপনা হয়েই দিন গুজারী, আপনা নামেই মোরা মরি

হাশরে উঠবো তোমায় স্মরি, এভাবেই যেন প্রার্থনা করি।

হে সালিকের আকাঁ! জীবন সায়াহ্নে হয় যেন এরূপরেখা

সম্মুখে হয় যেন পাক রওজা, মুখে যেন হয় কালিমা সখা।[৩]

এ মহামনীষী ৭৭ বছর বয়সে সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে রবিবার দুপুর বেলা ০৩ রমযানুল মুবারক, ১৩91 হিজরী মুতাবিক ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ১১ দিন হাসপাতালে থাকার পর আপন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ আবুল বারাকাত আহমদ সাহেব তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। গুজরাটের দীর্ঘ দিনের দরসগাঁতেই তাঁর অন্তিম শয়নের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি বছর ইংরেজি তারিখ হিসেবে ২৪ ও ২৫ অক্টোবর তাঁর ওরস শরীফ তাঁরই মাযার মুবারক, মুফতী আহমদ ইয়ার খান রোড, চক-গুজরাট, পাকিস্তানে অতি জাঁকজমকভাবে শরী'আতের আলোকে পালিত

---

[১]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, , পৃ.নং- ২০।

[২]- এই গ্রন্থটি মাকতাবা-এ রিজভীয়্যাহ, ৫১০-মেটিয়ামহল, জা'মে মসজিদ মার্কেট, দিল্লি-০৬, ভারত হতে ১৯৭৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩]- দীওয়ান-এ সালিক, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২৭।

হয়। মহান আল্লাহ তাঁর মর্যাদাকে বুলন্দ করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মকাম নসীব করুন, আমিন! বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব:

হাকীমুল উম্মাত অত্যন্ত পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। খুবই বিনয়ী[১] ও প্রচারবিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। পরহিযগার আল্লাহভীরু এই ব্যক্তি সর্বদা ইবাদতে রত থাকতেন। মা-বাবার অনুগত এবং সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন। খানদান-এ রাসূলের খুবই ইজ্জত করতেন। সময়ানুবর্তিতা এবং দূরদর্শিতা ছিল তাঁর অন্যতম গুণ। তিনি খুবই পরিশ্রমী ও প্রচন্ড সাহসী ছিলেন এবং সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন।[২] অত্যন্ত নম্র-ভদ্র এই মহান ব্যক্তি খুবই সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। শিক্ষার্থীদের মাঝে এমনভাবে বসতেন তাঁকে চেনা কষ্টকর হয়ে যেত। সারা জীবনে তিনি কারো থেকে কোন কর্জ নেননি এবং কাউকে কর্জ দেননি। কেউ কর্জ চাইলে হাদিয়া স্বরূপ সাধ্য মতো যা পারতেন দিয়ে দিতেন। মাদরাসার জন্য কখনো চাঁদা চাইতেন না। লোকজন এসে দিয়ে যেতেন। বড়দের আদব ও ছোটদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ধনী-দরিদ্র সবার সাথে একরূপ আচরণ করতেন। তিনি সুন্নাতে রাসূলের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন। ইসলামের জন্য তাঁর জন্ম হয়েছিল আর তিনি সাচ্চা মুসলমানের প্রতিচ্ছবি হয়েই রয়ে গেলেন।[৩] তিনি ছিলেন ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত- শরী‘আত যাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস, “মানুষের মধ্যে উত্তম হল ঐ ব্যক্তি যে তাদের মধ্য থেকে অধিক কুরআন পাঠকারী, যে দ্বীনের সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী, যে অধিক আল্লাহকে ভয়কারী, যে সবচেয়ে বেশী সৎকাজের আদেশ দানকারী, যে সর্বাপেক্ষা বেশী খারাপ কাজ থেকে নিষেধকারী এবং যে ব্যক্তি সকলের চেয়ে বেশী আত্মীয়তা রক্ষাকারী”।[৪] মুফতী সাহেব যেন এ হাদীছ শরীফেরই প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তিনি সফররত অবস্থায়ও নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন।[৫] সৈয়্যদুনা গাউছে জিলানীর এগারো সংখ্যার সাথে তাঁর গভীর সখ্যতা ছিল। তিনি ঘর তৈরি করেছেন এগারো কক্ষ বিশিষ্ট। তাফসীর নাঈমী শরীফে তিনি প্রত্যেক আয়াতের ক্ষেত্রে এগারোটি বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।[৬]

রচনাবলী:

জগতে যাঁরা চিরস্মরনীয় ও বরণীয় হয়ে রয়েছেন তাদের অনেকেই হয়তো যুদ্ধের ময়দানে শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করে অমর হয়েছেন অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞান-আবিষ্কার-উদ্ভাবনে চীর ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। এজন্য

---

[১]- তিনি খুবই বিনয়ী ছিলেন। সমকালীন ওলামাগণের মাঝে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন। আত্মপ্রচার তো দূরের কথা, কারো প্রশংসাতে খুবই লজ্জিত হতেন। একবার পাঞ্জাব প্রদেশের মিয়ানওয়ালী জেলার ওয়ানবুচরা নামক স্থানে এক মাহফিলে সভাপতি কাকে করবে তার সূত্রে ‘মালিক-এ মুদাররিসীন’ নামে খ্যাত আল্লামা আ‘তা মুহাম্মদ আ‘ওয়ান বুন্দিয়ালভী (র.আ) (১৯১৬-১৯৯৯খ্রি.) হাকীমুল উম্মাতকে জোর করে সভাপতির চেয়ারে বসালে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েন। তা দেখে আ‘তা বুন্দিয়ালভী মুফতী সাহেবকে ইঙ্গিত করে জনতাকে সম্বোধন করে বলেন, উপস্থিত ভাইয়েরা! আমার একটি কথা লিখে নাও! ‘যাঁর নিকট (জ্ঞানের) পূর্ণতা আছে তাঁর নিকট বিনয় আছে। আর যার নিকট (জ্ঞানের) পূর্ণতা নেই তার কাছে অহংকার থাকবে’। (সূত্র: আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৫০।)

[২]- ঐ, পৃ.নং-৪০-৫৭।

[৩]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং- ১৭।

[৪]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرَةَ ، عَنْ زَوْجِ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ ، عَنْ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ ، قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَؤُهُمْ وَأَتْقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ- (সূত্র: আহমদ ইবনু হাম্বল, আবূ আব্দিল্লাহ (১৬৪হি./৭৮০খ্রি.-২৪১হি./৮৫৫খ্রি.), আল-মুসনাদ, মুয়াস্‌সাসাতুন কুরতুবা, কায়রো, মিশর; তাবি, হাদীছ নং- ২৬৮১৯; আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি শাইবা, আবূ বকর (১৫৯হি./৭৭৬খ্রি.-২৩৫হি./৮৫০খ্রি.), আল-মুসান্নাফ, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯হি., হাদীছ নং-২৪৮৯২; আহমদ ইবনু মুহাম্মদ বিন সালামাহ আত-তাহাভী, আবূ জাফর (২২৮হি./৮৫২খ্রি.-৩২১হি./৯৩৩খ্রি.): মুশকিলুল আসার, প্রকাশনায়- দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-লেবানন; ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯হি., হাদীছ নং-৪৫৩০।

[৫]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং- ১৭।

[৬]- ঐ, পৃ.নং- ১৬।

আল্লামা শেখ মুসলেহ উদ্দিন সাদী (র.আ) (১২১০-১২৯১/৯২খ্রি.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কলম ও তরবারী চর্চা করেনি তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হারাম’। কিতাবুল হিদায়ার হাশিয়ায় বর্ণিত আছে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে জ্ঞানের দ্বারা জীবন নির্বাহ করেছে সে কখনো মরবে না’। কবি বলেন,

জীবিত রহে নাম জ্ঞানের কারণে, যুগ যুগ চিরদিন,
সন্তান রাখে নাম দু’এক স্তর, নয় তার বেশি দিন ।[১]

হাকীমুল উম্মাত জ্ঞানের আকাশের ঐ তারকা যিনি আজীবন মিল্লাতের খেদমত তো করেছেন; সাথে সাথে জ্ঞানের এক বিশাল আকরও রেখে গেছেন যা- কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের সঠিক দিশা দান করে যাবে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইমাম-এ আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম শাহ আহমদ রেযা খান বেরেলভী (র.আ.)-এর পর হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) হলেন ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত-এর সবচেয়ে বড় লেখক। তাঁর লেখাগুলো সর্বস্তরের মানুষের বুঝার জন্য খুবই সহজ। তিনি লেখনিকে আল্লাহ এবং তাঁর নবীর পক্ষ হতে তাঁর উপর বিশেষ দয়া হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

انگلیاں میری ہیں اور اس میں قلم ہے تیرا
ہاتھ میرا ہے مگر اس پر کرم تیرا-

আঙ্গুল আমার হলেও তাতে তো আপনারই কলম,
হাত আমার হতে পারে কিন্তু তার উপর তব করম।

তিনি কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি অনেক গ্রন্থের বিশদ বা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও রচনা করেছেন। বিশেষত দরসে নেজামীর প্রায় সকল গ্রন্থের টীকা তিনি লিখেছেন। তাঁর লিখিত প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী নিম্নরূপ-

প্রকাশিত গ্রন্থাবলীঃ

১) নূরুল ইরফান ফী হাশিয়াতিল কুরআন (উর্দূ) প্রকাশ কাল-১৩৭৭ হিজরী। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত।

২) আশরাফুত তাফাসীর যা তাফসীর-ই নাঈমী (উর্দূ) নামে সুপ্রসিদ্ধ। এগারো পারা পর্যন্ত অসমাপ্ত তাফসীর, বাংলা অনুবাদ চলমান। প্রথম প্রকাশ কাল-১৩৬৩ হিজরী।

৩) মিরআতুল মানাজীহ শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ (উর্দূ অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ), প্রকাশ কাল-১৩৭৮ হিজরী। (বাংলা অনুবাদ চলমান)

৪) ইজমাল তরজুমা-এ ইকমাল (সাহাবা ও তাবিঈগণের জীবনী),

৫) জা‘আল হাক্ব ওয়া যাহাক্বাল বাতিল ফী ফায়সালা-এ মাসাইল (উর্দূ) , ১ম খন্ড প্রকাশ কাল-১৩৬১ হিজরী, ১ম ও ২য় খন্ড একত্রে প্রকাশ কাল-১৩৭৬ হিজরী। (বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত)

---

[১]- জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আমজাদী, ফক্বীহ-এ মিল্লাত (১৩৫২হি./১৯৩৩খ্রি.-১৪২২হি./২০০১খ্রি.), ইলম ও আলিমের মর্যাদা (অনূদিত), (ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ মুহসীন, মাওলানা), সান্‌জরী পাবলিকেশন, ঢাকা-১২০৫; ১০ অক্টোবর-২০১১, ১১ জিলক্বদ-১৪৩২হি., ২৫ আশ্বিন-১৪১৮বঙ্গাব্দ, পৃ.নং-০৭।

৬) জমীমা জা'আল হাক্ব ওয়া যাহাক্বাল বাতিল ফী ফায়সালা-এ মাসাইল (উর্দূ) , ১ম খন্ড প্রকাশ কাল-তারিখ বিহীন। এটি জা'আল হাক্ব তৃতীয় খন্ডের সাথে যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

৭) শান-এ হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল কুরআন (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৬১ হিজরী। (বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত)

৮) জমীমা শান-এ হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল কুরআন (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৬৫ হিজরী। (বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত) এটি মূল কিতাবের সাথে যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

৯) ইলমুল মিরাছ (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৫২ হিজরী।

১০) রহমত-এ খোদা ব-উসীলা-ই-আউলিয়া আল্লাহ্ (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৭১ হিজরী। (বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত)।

১১) ক্বহর-এ কিবরিয়া বর মুনকিরীন-এ ইসমাত-এ আম্বীয়া (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৭৬ হিজরী। (বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত)

১২) ইসলামী যিন্দেগী (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৬৩ হিজরী। (বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত)

১৩) সালতানাত-এ মুস্তফা দর মামলাকাত-এ কিবরিয়া (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৬৭ হিজরী। (বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত)

১৪) আসরারুল আহকাম বি-আনওয়ারিল কুরআন (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৬৩ হিজরী (বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত)।

১৫) ইলমুল কুরআন লি-তারজুমাতিল ফুরক্বান (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৭১ হিজরী।

১৬) মু'আল্লিম-ই তাক্বরীর (উর্দূ) প্রকাশ কাল-মে-২০১০ খ্রি.।

১৭) সফর নামাঃ হজ্ব ওয়া যিয়ারাত (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৭৩ হিজরী।

১৮) সফর নামাঃ হিজাজ ওয়া কিবলাতাঈন (উর্দূ), প্রকাশ কাল- ১৩৭৫ হিজরী।

১৯) সফর নামাঃ হজ্ব ওয়া যিয়ারাত (উর্দূ), তারিখ বিহীন।

২০) রিসালা-এ নূর (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৭৫ হিজরী। (বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত)

২১) আমীর-ই মু'য়াবীয়া পর এক নজর (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৭৫ হিজরী। (বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত)।

২২) এক ইসলাম (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৭৫ হিজরী।

২৩) ইসলাম কী চার উসূলী ইস্তিলাহীঁ (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৮৪ হিজরী।

২৪) আল-কালামুল মাকবূল ফী ত্বাহারাতি নাসবির রাসূল (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৮৪ হিজরী।(বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত)

২৫) ফাতাওয়া-এ নাঈমীয়্যাহ (উর্দূ) , প্রকাশ কাল-১৩৫৭ হিজরী।

২৬) খুৎবাত-এ নাঈমীয়্যাহ, প্রকাশ কাল-১৪০৪হিজরী/১৯৮২খ্রি.।

২৭) মাওয়াইয-ই নাঈমীয়্যাহ ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড (উর্দূ), প্রকাশ কাল-তারিখ বিহীন। (এক খন্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত)

২৮) মুহামিদে পঁয়গাম্বরী যা দীওয়ান-এ সালিক নামে পরিচিত (উর্দূ-আরবী-ফার্সী-হিন্দী ভাষায় রচিত হামদ, না'ত, জন্মগীতি, প্রশংসাগীতি, গজল ও চতূর্পদী কবিতা গ্রন্থ), প্রকাশ কাল-১৩৫৭ হিজরী।

২৯) দারসুল কুরআন (উর্দূ), প্রকাশ কাল-১৩৫৭ হিজরী। (বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত)

৩০) ফায়দ্বান-এ সূরা নূর (উর্দূ), ১৪৩৪হি./জুন-২০১৩খ্রি.।

অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী:

১) নাঈমুল বারী ফী ইনশিরাহ-ই বুখারী প্রকাশ নাঈমুল বারী (আরবী ভাষায় সর্ম্পূণ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)।
২) হাশিয়া-এ সদরা (আরবী ভাষায় লিখিত দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ)।
৩) হাশিয়া-এ হামদুল্লাহ (আরবী ভাষায় লিখিত তর্কশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ)।
৪) ইনযাহ-এ বুখারী (উর্দূ ভাষায় লিখিত নাহুশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ)।
৫) রিসালা-এ তাসাউ্উফ (উর্দূ ভাষায় লিখিত সূফীতাত্তিক গ্রন্থ)।
৬) হাশিয়া-এ মাদারিজুন নাবুওয়াত (উর্দূ)

তিনি প্রায় ৫০০ গ্রন্থ রচনা করেন। আরো অনেক গ্রন্থের টীকা-টীপ্পনীও রচনা করেছিলেন যা, দেশবিভাগের সময় হিযরতকালে নষ্ট হয়ে গেছে। এর মধ্যে কিছু প্রকাশিত হয়েছে। কিছু অপ্রকাশিত আছে। অবশিষ্ট গুলির কিছু অযত্নের কারণে প্রকাশ অযোগ্য। আর কিছু উঁইপোকায় খাওয়া যার পাঠোদ্ধার অসম্ভব।[১] আর কিছু অসমাপ্ত বা কিছু অংশ হারিয়ে গেছে অথবা কেউ নিয়ে গেছে। বর্তমানে এগুলির কোন নাম-গন্ধও নেই।[২] মুফতী সাহেব তাঁর লেখনীর মাধ্যমে কাফির, মুশরিক, নাস্তিক, মুতাযিলা, শী'য়া, কাদিয়ানী, ওহাবী, আহলে হাদীস, আহলে-কুরআন (হাদীছ অস্বীকারকারী)সহ সকল ভ্রান্ত দলের খন্ডন করেছেন। তাঁর রচিত 'জা'আল হক্ব' বাতিলদের জন্য ভূমিকম্পস্বরূপ। তিনি প্রমাণ করে গেছেন- 'একজন ফক্বীহ (শরয়ী' বিশেষজ্ঞ) শয়তানের মুকাবিলায় হাজার ইবাদতকারীর তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী'।[৩]

---

[১]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, , পৃ.নং-২২-২৫।

[২]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৫৫০।

[৩]- মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, আবূ ঈসা (২০৯হিঃ/৮২৪খ্রিঃ-২৭৯হিঃ/৮৯২খ্রিঃ), আল-জামী' আস-সুনান, দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী; বৈরুত, লেবানন; তারিখ বিহীন, খন্ড-০৯, পৃ.নং-২৯৫, হাদীছ নং-২৬০৫; শু'আবুল ঈমান, খন্ড-০৩, পৃ.নং-৩৪৪, হাদীছ নং-১৫৮৬; আল-মু'জাম আল-কাবীর, খন্ড-০২, পৃ.নং-১৬১, হাদীছ নং-১১০৯; মুহাম্মদ বিন আব্দিল্লাহ আত-তিবরিযী, ওয়ালীউদ্দীন (ওফাত-৭৪১হি./১৩৪০খ্রি.), মিশকাতুল মাসাবীহ, মাকতাবাহ আল-ফাতাহ, বাংলাবাজার, ঢাকা, তারিখ বিহীন অধ্যায়ঃ ইলম, পৃ.নং-৩৪।

ঘ. তৃতীয় অধ্যায়:

আক্বীদা সংক্রান্ত ইসলামী সাহিত্যচর্চা

আরবী শব্দ আক্বদ অর্থ: বন্ধন বা গিরা। সে মতে আক্বীদা হল মজবুত করে বাঁধা বা দৃঢ় বিশ্বাস। মানুষ ধর্ম বিশ্বাস হিসাবে হৃদয়ে গহীনে যা ধারণ করে তাকে আক্বীদা বলে।[১]

‘আক্বীদা শব্দটি (عَقْدٌ) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করা। ইসলামের পরিভাষায় “আকীদা” অর্থ দৃঢ় ও মজবূত ঈমান, অকাট্য প্রমান ভিত্তিক খবরাখবর ও বিষয়াবলীর প্রতি মনের অটল বিশ্বাস। “আকীদা” শব্দের বহুবচন আক্বাঈদ। এ‘তেকাদ (إِعْتِقَادٌ) শব্দটিও আক্বীদা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ‘তেকাদ শব্দের অর্থ বহুবচন এ‘তেকাদাত (إِعْتِقَادَاتٌ)’।[২]

শরী‘আতের পরিভাষায় ‘আক্বীদা হচ্ছে, মহান আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর ফিরিশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস তথা মৃত্যু পরবর্তী যাবতীয় বিষয় ও তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি এবং আল-কুরআনুল হাকীম ও সহীহ হাদীসে উল্লিখিত দ্বীনের সকল মৌলিক বিষয়ের প্রতি অন্তরের সুদৃঢ় মজবুত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসের নাম ‘আক্বীদাহ’।[৩]

বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বুঝাতে মুসলিম সমাজে সাধারণত দু’টি শব্দ ব্যবহৃত হয় ঈমান ও আক্বীদা। কুরআন কারীম ও হাদীছ শরীফে সর্বদা ‘ঈমান’ শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ‘আক্বীদা’ ব্যবহৃত হয়নি। দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে তাবিঈ (সাহাবীগণের ছাত্র) ও পরবর্তী যুগের ঈমামগণ (ধর্মীয় নেতা) ধর্মবিশ্বাসের খুটিনাটি বিষয় আলোচনার জন্য ‘ঈমান’ ছাড়াও অন্যান্য কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন। এসকল পরিভাষার মধ্যে রয়েছে ‘আল-ফিকহুল আকবার’, ‘ইলমুত তাওহীদ’, ‘আস-সুন্নাহ’, ‘আশ-শরী‘আহ’, ‘উসূলুদ্বীন’, ‘আল-আক্বীদাহ’ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে ‘আক্বীদাহ’ শব্দটিই অধিক প্রচলিত।[৪]

আক্বীদা হলো মু’মিনের যাবতীয় কর্মের ভিত্তি। আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে জন্মই বৃথা। তাই মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী (র.আ.) আক্বীদাকে প্রাধান্য দিয়ে এবিষয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে ইসলামী আক্বীদাকে সুসংহত-সমুন্নত এবং কলুষ মুক্ত করেছেন। বিশেষত তাঁর সমকালীন বাতিল মতবাদের খন্ডনে তিনি সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। লিখনী, শিক্ষা এবং ওয়াজের মাধ্যমে তিনি এই ক্ষেত্র সমৃদ্ধ করে ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত’-এর প্রকৃত রূপ সূফীবাদী ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী মুসলিম উম্মাহর উপর বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। নিম্নে আক্বীদা বিষয়ক তাঁর রচনাবলীর উপর আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

---

[১]- সূত্রঃ https://bn.wikipedia.org/wiki/আকীদা

[২]- হেমায়েত উদ্দিন, মাওলানা মুহাঃ (জন্ম-১৯৬০খ্রি.), ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, থানভী লাইব্রেরি, ঢাকা-বাংলাদেশ, চতুর্থ প্রকাশ-২০০৭ ঈসায়ী, পৃ.নং-৩৭।

[৩]- মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম, শাইখ (১৩১১হি./১৮৯৩খ্রি.-১৩৮৯হি./১৯৬৯খ্রি.), মুখতাসার আক্বীদাতু আহলিস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত, আল-মাফহুম ওয়াল খাসাইস, ওয়াজারাতুল আওক্বাফ ওয়াশ শুয়ূনি, রিয়াদ-সৌদি আরব, ২৬ অক্টোবর-২০১৩খ্রি., পৃ.নং-১০।

[৪]- আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খোন্দকার, ড. (১৯৬১-২০১৬), কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, যুলহাজ্জা-১৪২৮হি./ডিসেম্বর-২০০৭ ঈসায়ী, পৃ.নং-১৫।

জা'আল হাক্ব ওয়া যাহাক্বাল বাতিল ফী ফায়সালা-এ মাসাইল

(جاء الحق وزھق الباطل فی فیصلے مسائل)

হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) রচিত 'জা'আল হাক্ব' আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত-এর আক্বীদা-আমলকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে বড় নেয়ামত। এতে হাকীমুল উম্মাত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা সূফীবাদী ইসলামের বেরেলভী ধারার চিন্তা-চেতনার বিশুদ্ধতার ভাষ্য এবং মতবিরোধপূর্ণ শাখা ও দলগত মাসআলাসমূহের তাত্ত্বিক ও দালীলিক আলোচনা সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এর রচনার কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার আলোচিত মাসআলা সমূহ আ'লা হযরত, সদরুল আফাযীল এবং অন্যান্য সুন্নী ওলামাগণের বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমি ইচ্ছা করলাম এমন একটি কিতাব লিখবো; যাতে এই সকল মাসআলা এক সাথে পাওয়া যাবে। যার কাছে এই বইটি থাকবে তিনি বিরোধীদের সাথে বর্ণিত বিষয় সমূহের উপর আলোচনা করতে সক্ষম হবেন এবং মুসলমানদের আক্বীদাকে ঐ লোকগুলির হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন। তাই আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি এই বই রচনা শুরু করি'।[১] ৬৯০ পৃষ্টার এই বইটির প্রথম অংশ (২৭ অধ্যায়) শাবান-১৩৬১ হিজরীতে লেখা শুরু করে জিলক্বদ-১৩৬১ হিজরীতে তিন মাসের মধ্যে শেষ করেন। আর দ্বিতীয় অংশ (২৫ অধ্যায়) দুইমাস দুই দিনে ০১ রমযান-১৩৭৬ হিজরী থেকে ০৩ জিলহজ্ব-১৩৭৬ হিজরীতে শেষ করেন। এই গ্রন্থে নিম্নোক্ত নির্বাচিত বিষয় সমূহের উপর আলোচনা স্থান পেয়েছে-

১. তাক্বলীদ তথা মাযহাবের অনুসরণ করা প্রসঙ্গ।
২. ইলম-এ গাইব (নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম-এর অদৃশ্যজ্ঞান প্রসঙ্গ), উসীলা (বিপদ মুক্তি ও প্রয়োজন পূরণে আল্লাহর নিকট বুযর্গব্যক্তি বা তাঁদের ব্যবহৃত বস্তুকে মাধ্যম বানানো প্রসঙ্গ, নযর-নেয়ায (বুযর্গব্যক্তির শুভদৃষ্টি লাভের আশায় আল্লাহর নামে মান্নত করা প্রসঙ্গ)।
৩. হাযির-নাজির (নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম জীবিত এবং তাঁরা যে কোন স্থানের উম্মতের অবস্থা দেখতে সক্ষম এবং আহ্বানে উপস্থিত হতে পারেন এই বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গ)।
৪. নূরানিয়্যাত-এ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার দালীলিক আলোচনা প্রসঙ্গ)।
৫. নিদা ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলে আল্লাহর হাবীবকে আহ্বান করা জায়িয হওয়া প্রসঙ্গ)।
৬. ইস্তিমদাদ-এ আম্বীয়া ওয়া আউলিয়া (নবীগণ ও ওয়ালীগণ হতে সাহায্য প্রার্থনা করা জায়িয হওয়া প্রসঙ্গ)।
৭. বিদ'আত (নব আবিঃষ্কৃত বিষয়ে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গ)।
৮. ঈদ-এ মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথা প্রিয় নাবীর শুভাগমন উপলক্ষে খুশি উদযাপন করা প্রসঙ্গ)।
৯. মিলাদ শরীফ-এ ক্বিয়াম (দাঁড়িয়ে সালাত-সালাম পড়া) করা জায়িয প্রসঙ্গ।
১০. ঈসাল-এ ছাওয়াব, খতম শরীফ বা ফাতিহা পড়া (মৃতের রুহে সওয়াব প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনুল কারীমসহ বিভিন্ন কল্যাণকর ইসিম (আল্লাহপাকের গুণবাচক নাম) ও দরুদ শরীফের খতম আদায় করা জায়িয হওয়া প্রসঙ্গ)।

---

[১]- আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, জা'আল হাক্ব ওয়া যাহাক্বাল বাতিল ফী ফায়সালা-এ মাসাইল, নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান, তারিখ বিহীন, পৃ.নং-০৮।

১১. জানাযার নামাযের পর দো'আ প্রসঙ্গ (জানাযার নামায আদায় করে মৃতের মাগফিরাত কামনায় হাত তুলে দো'আ-মুনাজাত করা প্রসঙ্গ)।

১২. ওয়ালীগণের মাযারের উপর গুম্বুজ তৈরি করা (সত্যিকারের আউলিয়া-এ কিরামের কবর শরীফের উপর গুম্বুজ তৈরি করা প্রসঙ্গ)।

১৩. মাযারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গ।

১৪. কবরের পাশে আযান দেয়া (মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর শয়তানের প্ররোচনা হতে রক্ষার নিমিত্তে আযান প্রদান করা প্রসঙ্গ)।

১৫. উরছ পালন করা (বুযর্গগণের ওফাত দিবসকে কেন্দ্র করে ফাতিহাখানীর আয়োজন করা প্রসঙ্গ)।

১৬. কবর যিয়ারত করা প্রসঙ্গ।

১৭. কাফনে আহাদনামা লিখা প্রসঙ্গ।

১৮. বড় আওয়াজে যিকির করা প্রসঙ্গ।

১৯. ওয়ালীগণের নামের প্রতি সম্পর্কিত করে পশুপালন করা প্রসঙ্গ।

২০. বুযর্গগণের বরকতমন্ডিত বস্তুকে চুমু দেয়া বা পবিত্র হাতে চুমু দেয়া প্রসঙ্গ।

২১. আব্দুনন্নাবী বা আব্দুর রাসূল নাম রাখা জায়িয হওয়া প্রসঙ্গ।

২২. ইসক্বাত (গর্ভপাত বিষয়ক ফিক্বহী মাসআলা)।

২৩. শরয়ী' হিলার বৈধতা (শরয়ী' কোন বিষয়ে বিকল্প ব্যবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গ)।

২৪. 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম শুনে আঙ্গুলী চুমু খাওয়া প্রসঙ্গ।

২৫. দেওবন্দীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-ইবাদতের উপর পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনা প্রসঙ্গ।

২৬. ইসমাত-এ আম্বীয়া (নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গ)।

২৭. বিশ রাকা'আত তারাবীহ প্রসঙ্গ।

২৮. তিন তালাক প্রসঙ্গ।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে বিদগ্ধ আলিম সমাজ নানান মন্তব্য করে এর মর্যাদাতো বাড়িয়েছেন। সাথে সাথে মুসলিম সমাজে এর প্রয়োজনীতাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর নাম রাখেন পীর সৈয়্যদ জামা'আত আলী শাহ (১৮৪১খ্রি.-১৯৫১খ্রি.) মুহাদ্দিছ আলীপূরী (র.আ.)।[১]

- পীর সৈয়্যদ জামা'আত আলী শাহ এই বই সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'এই গ্রন্থটি কিয়ামত অবধি অনিঃশেষ থাকবে। এর প্রতি উত্তর কেউ লিখতে পারবে না। এর বিরুদ্ধে যে কলম ধরবে সে নিঃসন্দেহে বাতিলই হবে'।[২]
- মুফতী শাহ হুসাইন গিরদিজী বলেন, 'হাকীমুল উম্মাতের লিখিত 'জা'আল হাক্ব' কিতাবটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার সমাধানে এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। পাক-ভারতের সকল হক্বপন্থী আলিম এটিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন'।[৩]

---

[১]- তিনি 'আমীর-এ মিল্লাত' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোটের সাইদান জেলার আলীপুরে ১৮৪১ সালে মতান্তরে ১৮৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পীর-এ তরীক্বত ছিলেন। ৫০ বারের অধিক হজ্জ, হাজারের অধিক মসজিদ এবং অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন এবং অল ইন্ডিয়া সুন্নী কনফারেন্সের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২৬ জিলক্বদ ১৩৭০ হি. মুতাবিক ৩০ আগষ্ট ১৯৫১ সালে ইন্তেকাল করেন। (সুত্রঃ https://ur.wikipedia.org/wiki/سید_جماعت_علی_شاہ)

[২]- নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং- ২২।

[৩]- সাঈদুল্লাহ খান ক্বাদিরী, মুফতী, সাঈদুল হাক্ব ফী তাখরীজ-এ জা'আল হাক্ব, মাকতাবা-এ গাউছিয়া, করাচী-পাকিস্তান; ১৪৩১হি./২০১০খ্রি., পৃ.নং- ১৬।

- মুফতী-এ আজম পাকিস্তান মুফতী মুনীবুর রহমান (মু.জি.আ.) বলেন, 'জা'আল হাক্ব' বইটি এমন গভীর জ্ঞান ও বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ যে, এটি সমমনাদের জন্য নিজেদের মসলকের সত্যতার পক্ষে প্রশান্তি দানকারী এবং বিরোধীদের জন্য অকাট্য দলীল ও পূর্ণ প্রামান্য গ্রন্থ সাব্যস্ত হয়েছে'।[১]
- আল্লামা বশীর ফারুক্বী আত্তারী বলেন, 'জা'আল হাক্ব' হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) রচিত এমন গ্রন্থ যা বিশ্বমুসলমানের ঈমান-এর রক্ষক এবং উজ্জ্বলতা দানকারী। তদসঙ্গে সাধারণ মুসলমানদের আক্বীদার পরিশুদ্ধতার জন্য সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক'।[২]
- পীর মুফতী সৈয়্যদ আহমদ আলী শাহ নক্বশেবন্দী (র.আ) বলেন, 'আমি এই গ্রন্থটি অদ্যপান্ত পাঠ করেছি। এটিকে আমি সঠিক পথের রীতির উপরই পেয়েছি। গ্রন্থকার এটিকে খুই মজবুত ও অকাট্য দলীল দ্বারা সজ্জিত করেছেন এবং বাতিল-দেওবন্দী-ওয়াহাবীদের উচ্চাঙ্গের ভাষায় প্রতিউত্তর করেছেন এবং 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর সত্যতাকে অসংখ্য দলীলের মাধ্যমে প্রমান করেছেন'।[৩]
- আলিম-এ হক্কানী আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ইসমাঈল নূরানী সাহেব বলেন, 'হাকীমুল উম্মাত'-এর এই গ্রন্থটি স্বপক্ষীয় বা বিরোধীপক্ষ উভয় দলের জন্য সমান উপকারী। স্বপক্ষীয়গণের জন্য নিজেদের ঈমান-আক্বীদাকে মজবুত করার হাতিয়ার হবে এটি। আর বিরোধীপক্ষকে সৎপথ দেখাবে এই বই'।[৪]
- শাইখ বিলাল আহমদ সিদ্দিকী বলেন, 'বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা সমূহ সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণধর্মী, পরিপূর্ণ দলীল-প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজের দাবীর পক্ষে বিরোধকারীদের আপত্তির জবাবসমূহ কুরআন-হাদীস-এর উদ্বৃতি, বুযর্গানে দ্বীন-মুহাদ্দিস-মুফাস্‌সিরগণের উক্তি, গ্রহণযোগ্য ফিক্বহের কিতাবাদি এবং বিরোধীদের গ্রন্থ হতে প্রদান করেছেন। এটি সবদিক দিয়ে এমন এক পূর্ণ গ্রন্থ যার মধ্যে মাসআলাসমূহ যথার্থ মুন্সিয়ানার মাধ্যমে সহজ ভাষায় সমাধান করা হয়েছে'।[৫]
- আহমদ রিবাত আল-হালভী নামে এক আরবী কবির কবিতা এই বইয়ের ব্যাপারে যুৎসই হয়ে যায়। কবি বলেন,

هذا كتابٌ لو يباع بوزنه
ذهباً لكان البائع مغبونا-
أو ما من الخسران أنك آخذٌ
ذهباً و تترك جواهراً مكنونا-

এমন গ্রন্থ যদি বিক্রি হয়- তার ওজনসম স্বর্ণে
অবিচার করবে বিক্রেতা, শুনো ও ভাই কর্ণে।।
ওভাই ক্রেতা! ঠকবে না তুমি এমন আকর কিনে,
পুঞ্জীভূত রত্ন ছেড়ে নেবে- এই বই যে চিনে।।[৬]

---

[১]- ঐ, পৃ.নং- ১৭।
[২]- ঐ, পৃ.নং- ১৮।
[৩]- ঐ, পৃ.নং- ২০।
[৪]- ঐ, পৃ.নং- ২২।
[৫]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, , পৃ.নং-২৯৭ ও ৩০৬।
[৬]- সাঈদুল্লাহ খান ক্বাদিরী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং- ২১।

মুফতী আব্দুল হামীদ নঈমী বইটির ৩১টির অধিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ওলামা-মাশাইখ কেন এই বই পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। বইটির আজও এতই গ্রহণযোগ্যতা কেন! ইন-শা আল্লাহ! কিয়ামত অবধি এই বই সঠিক পথ থেকে চ্যুত লোকদের রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা এবং তাঁর শিক্ষা দিয়ে আলোর পথ দেখাতে থাকবে। লোকজন নাবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অপরিসীম মর্যাদা এবং তাঁর গুণগত শিক্ষা সম্পর্কে জেনে লেখক মহোদয়কে বড়ই প্রশংসার সাথে স্মরণ করতে থাকবে'।[১]

এই গ্রন্থটি হাকীমুল উম্মাত ০২ জিলহজ্ব ১৩৭৬ হিজরী মুতাবিক ০১ জুলাই ১৯৫৭ সালের সোমবার দিন সমাপ্ত করেন। প্রকাশের পর থেকে বইটি ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ২৮ বার ছাপনো হয়েছে। প্রত্যেকবার দুই হাজার কপি করে ছাপানো হয়। ইসলামী বিশ্বের প্রায় দেশেই বইটি পাওয়া যায়।[২] নানান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তন্মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রথম অংশ (শাহযাদা) মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আলম ও অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান-এর যৌথ অনুবাদে এবং দ্বিতীয় অংশ অধ্যাপক লুৎফুর রহমান সাহেব-এর একক অনুবাদে হাফেজ মৌলানা মঈনুল ইসলামের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা 'মুহাম্মদী কুতুবখানা' হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৃতীয় অংশ অধ্যক্ষ ক্বারী নূরুল আলম খাঁন সাহেব-এর অনুবাদে অধ্যাপক লুৎফুর রহমান-এর সম্পাদনায় একই প্রকাশনী হতে ১৫ অক্টোবর ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়।

'জা'আল হাক্ব' বইটি ইংরেজি ভাষায় দক্ষিণ আফ্রিকা হতে সৈয়্যদ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন মিসবাহী প্রকাশ করেন।[৩] বইটির এ্যাপসও তৈরি করা হয়েছে। গুগল স্টোরে নিম্ন লিংক-এ (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wafasoft.ja_al_haq_wa_zahaqal_batil&hl=en_US) বইটি পাওয়া যাবে।

এই বই তৎকালীন সময়ের রচনা রীতি অনুসারে লেখা হয়েছে। বর্তমান আধুনিক গবেষণা পদ্ধতির যুগে অনেক বাতিল এর তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার যাতে সাহস না করে তার নিরীখে এই আকর গ্রন্থটিকে আধুনিক গবেষণা রীতিতে সজ্জায়ন করা অতীব জরুরী ছিল। আহলে হকের পরিচয় এই 'জা'আল হাক্ব'-এর তথ্যসূত্র বের করে এবং প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযুক্ত করে 'সাঈদুল হাক্ব ফী তাখরীয-এ জা'আল হাক্ব' নামে নবরূপে প্রকাশ করে মুসলিম উম্মাহর উপর বড়ই অনুগ্রহ করেছেন বর্তমান সময়ে সাড়া জাগানো উর্দূ গবেষক আল্লামা মাওলানা সাঈদুল্লাহ খান ক্বাদিরী। বইটি মাকতাবা-এ গাউছিয়া, করাচি-পাকিস্তান হতে আল্লামা সৈয়দ মুজাফ্ফর হুসাইন শাহ ক্বাদিরীর সম্পাদনায় ১৪৩১ হিজরী মুতাবিক ২০১০ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[১]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং- ৫৭৮।

[২]- ঐ, পৃ.নং- ৫৭৬।

[৩]- ঐ, পৃ.নং-১৯।

আমীর মু‘য়াবিয়া পর এক নজর

(امیر معاویہ پر ایک نظر)

গ্রন্থটি হাকীমুল উম্মাত ঐসব সুন্নীদের লক্ষ্য করে রচনা করেছেন, যারা আবেগের বশঃবর্তী হয়ে ভুল বুঝে হযরত আমীর মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর নিন্দা করে। সাহাবী হিসেবে তাঁর শান-মান অস্বীকার করে। হযরত আমীর মু‘য়াবিয়া (রা.) মু’মিনদের খলীফা সৈয়্যদুনা আলী মুরতাদ্বা (রা.)-এর সাথে মুসলমানদের তৃতীয় খলীফা কুরআন একত্রিতকারী হযরত ওসমান ইবনু আফ্‌ফান (রা.)-এর হত্যাকান্ডের বিচারকে কেন্দ্র করে উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং ইমাম হুসাইন (রা.)-এর খিলাফত না পাওয়া ও ইয়াজীদের খলীফা হওয়া নিয়ে রাফেযীরা[১] ওয়াহী লিখক বুযর্গ সাহাবী হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-কে মুসলমান মনে করে না। এমনকি তাঁকে যে মুসলমান মনে করবে তাকেও তারা কাফির মনে করে। অথচ ইমাম আজম আবূ হানীফা নু‘মান ইবনু সাবিত (৮০হি./৬৯৯খ্রি.-১৫০হি./৭৬৭খ্রি.) আল-কুফী (রা)[২] সহ সিহাহ সিত্তার ইমামগণ[৩], আক্বাঈদ শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ ইমামগণ এবং ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত’-এর আক্বীদা হলো- “তিনি একাধারে বিশিষ্ট সাহাবী, বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, সুদক্ষ শাসক, ঝানু কুটনীতিক ও সুনিপুন রণকৌশলী যোদ্ধা ছিলেন। পবিত্র ওয়াহী লেখক সাহাবীদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা.)-এর ভাই হিসেবে আত্মীয় এবং উম্মতের মামা।[৪] ইমাম ইবনু কুদামা আল-মাকদাসী (র.আ.) বলেন,- ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم অর্থাৎ- হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মু’মিনদের মামা, আল্লাহর ওয়াহীর লেখক এবং মুসলমানদের খলিফাগণের অন্তর্ভূক্ত।[৫] সৈয়্যদুনা আলী ইবনু আবী তালিব (রা.)-এর ওয়াফাতের পর তিনি মুসলিম জাহানের প্রথম সুলতান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখনকার জীবিত সাহাবা ও তাবিঈগণের কেউই তাঁর শাসনের বিরোধীতা করেননি। তিনি বহুগুণে গুণান্বিত সুযোগ্য প্রশাসক ছিলেন।[৬]

---

[১]- আহল-এ বাইত-এর প্রতি মুহাব্বতের দাবীদার এবং সাহাবীগণ (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন গোষ্টি। এ বিদ্বেষের ফলে ওদের অধিকাংশ মূলত আহল-এ বায়ত হতে বিচ্ছিন্ন। এরা শী‘আ দলভূক্ত।

[২]- ইমাম আজম ফিক্বহুল আকবার-এ বলেন, ‘আমরা আহলে সুন্নাত সমস্ত সাহাবার প্রতি মহব্বত পোষন করি এবং তাঁদেরকে প্রশংসার সাথে স্মরণ করি’। এর ব্যাখ্যায় ইমাম মুল্লা আলী আল-ক্বারী বলেন, ‘যদিও কতেক সাহাবা হতে বাহ্যত দেখতে মন্দ কিছু কাজ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু ওগুলো সব ইজতিহাদগত কারণে ছিল, ঝগড়া বিবাদের কারণে নয়’। (সূত্রঃ আলী বিন সুলতান আল-ক্বারী আল-হানাফী, মুল্লা (ওফাত-১০১৪হি./১৬০৬খ্রি.), শারহুল ফিক্বহিল আকবার, দারুল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা, মিসর; তারিখ বিহীন, পৃ.নং-৬৩।)

[৩]- হযরত সৈয়্যদুনা আমীর মু‘য়াবিয়া (রা.) কর্তৃক ১৬৩টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে ০৪টি ইমাম বুখারী (রা.) ও ইমাম মুসলিম (রা.) যৌথভাবে, ০৪টি কেবল ইমাম বুখারী (রা.), ০৫টি ইমাম মুসলিম (রা.) এবং অবশিষ্ট হাদীছ সমূহ ইমাম আহমদ (রা.), ইমাম আবূ দাউদ (রা.), ইমাম নাসাঈ (রা.), ইমাম বায়হাকী (রা.), ইমাম তাবরানী (রা.), ইমাম তিরমিযী (রা.) প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। (সূত্রঃ আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, আমীর মু‘য়াবিয়া পর এক নজর (অনূদিত), মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা-চট্টগ্রাম; প্রকাশকালঃ ০১ জুলাই-১৯৯৬খ্রি., পৃ.নং-৪৫।

[৪]- জালাল উদ্দীন রুমী, মুল্লা (১২০৭খ্রি.-১২৭৩খ্রি.), মাছনাভী শরীফ, হামীদ এন্ড কোম্পানী, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; পৃ.নং-১৪।

[৫]- ইবনু কুদামা, আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ আল-মাক্বদাসী (৫৪১হি.-৬২০হি.), লুম‘আতুল ই‘তিকাদ আল-হাদী ইলা সাবিলির রাশাদ, মাকতাবাহ আদ্বওয়াউস সালাফ, রিয়াদ-সৌদি আরব; তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৫হি./১৯৯৫খ্রি. পৃ.নং-১৫৫। ‘কোন একজন আমীরে মু‘য়াবিয়া সম্পর্কে হুজুর গাইছে পাকের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি ফরমালেন- আমীরে মু‘য়াবিয়ার শান খুবই উচ্চ। তিনি হুজুরের শালা, ওয়াহী লিখক ও বিশিষ্ট সাহাবী’। (সূত্রঃ আমীর মু‘য়াবিয়া পর এক নজর (অনূদিত), পৃ.নং-১০০।)

[৬]- রাসূল (সা.) নিজে হজরত মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর জন্য আল্লাহর দরবারে দো‘আ করেন। হজরত আব্দুর রহমান ইবনু আবী উমায়রা (রা.) বলেন, “রাসুল (সা.) মু‘য়াবিয়ার জন্য এ দো‘আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! মু‘য়াবিয়াকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন ও তাঁকে পথপ্রদর্শক হিসেবে কবুল কররুন”। (সূত্রঃ মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, আবু ঈসা তিরমিযী (২০৯হিঃ/৮২৪খ্রিঃ-২৭৯হিঃ/৮৯২খ্রিঃ), আল-জামি‘ আস-সুনান, হাদিস নং-৩৮৪২।)

হযরত ইরবাদ্ব বিন সারিয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, “হে আল্লাহ! তুমি মু‘য়াবিয়াকে কুরআন এবং হিসাব-নিকাশের জ্ঞান দাও এবং তাঁকে (জাহান্নামের) আযাব থেকে রক্ষা কর”। (সূত্রঃ আহমদ ইবনু হাম্বল আশ-শায়বানী, আবু আব্দিল্লাহ (১৬৪হিঃ/৭৮০খ্রিঃ-২৪১হিঃ/৮৫৫খ্রিঃ), আস-সুনানুল কুবরাহ, প্রকাশনায়- মুয়াস্‌সাতুন কুরতুবা, কায়রো, মিসর; তাবি, হাদীছ নং-১৭২০২।)

‘আমীর মু‘য়াবিয়া পর এক নযর’ গ্রন্থটি রচনার কারণ সম্পর্কে হাকীমুল উম্মাত বলেন, বর্তমানে অনেক সুন্নী দাবীদার মুসলমান ‘মু‘য়াবিয়া’ বিদ্বেষী রোগে আক্রান্ত। এ নাজুক অবস্থা দেখে আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি পীর সৈয়্যদ মুহাম্মদ মা‘সুম শাহ নাওশাহী (মা.জি.আ.) এই বিষয়ে গ্রন্থ রচনার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেন যাতে, এ রোগের পরিপূর্ণ চিকিৎসা হয়, মুসলমানদের অন্তর সাহাবীগণ ও আহলে বায়তের প্রেমে ভরপুর হয় এবং হৃদয়ে আমীর মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর মহব্বত ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই পুস্তক রচনায় হাত দিলাম।[1]

বইটির আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে শাইখ বিলাল আহমদ সিদ্দিকী বলেন, ‘লেখক মহোদয় এতে আমীর মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রতিভাত করে বয়োজৈষ্ঠ্য সাহাবাগণ বিশেষত আমীর মু‘য়াবিয়ার মর্যাদা বর্ণনা পূর্বক তাঁর উপর আরোপিত আপত্তিসমূহের প্রতিউত্তর দিয়েছেন’।[2]

এছাড়া হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, “একদিন জিব্রাঈল (আ.) রাসুল অতুল (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, ‘হে মুহাম্মদ (সা.)! মু‘য়াবিয়ার উপর শান্তি বর্ষন করুন এবং তাঁকে সদুপদেশ দিন; কেননা সে আল্লাহর কিতাবের আমানতদার, আর সে কতইনা উত্তম আমানতদার’। (সূত্রঃ আবুল কাসিম আহমদ, ইমাম তাবারানী (২৬০হি:/৮২১খ্রি:-৩৬০হি:/৯১৮খ্রি:), আল-মু‘জামুল আওসাত, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মৌসুল-ইরাক; ২য় প্রকাশ, ১৪০৪হি./১৯৮৩খ্রি., হাদিস নং-৩৯০২; ইসমাঈল ইবনু ওমার আদ-দিমাশক্বী, আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর (৭০১হি./১৩০১খ্রি.-৭৭৪হি./১৩৭৩খ্রি.), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, বৈরুত-লেবানন; ১৪১০হি./১৯৯০খ্রি., খন্ড-০৮, পৃ.নং-১২৩।)

অপর এক হাদীছ শরীফে হুজুর পূরনূর (সা.) তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। হজরত উম্মু হারাম (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, “আমার উম্মতের মধ্য সর্বপ্রথম সামুদ্রিক অভিযানে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদলের জন্য জান্নাত অবধারিত”। (সূত্রঃ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, আবু আব্দিল্লাহ (১৯৪হি:/৮১০খ্রি:-২৫৬হি:/৮৭০খ্রি:), আল-জামি‘ আস-সাহীহ, দারু তাওকিন নাজাত, আল-মাকতাবাতুশ শামিলা; ১ম প্রকাশ ১৪২২হি., খন্ড-০৩, পৃ.নং-১১, হাদীছ নং-২৯২৪।) এ হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় হযরত মুহাল্লাব (রহ.) বলেন, ‘এতে হজরত মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। কেননা হজরত মু‘য়াবিয়া (রা.)-ই ছিলেন ওই বাহিনীর সেনাপতি’। (সূত্রঃ আহমদ ইবনু হাযর আসক্বালানী (৭৭৩হি./১৩৭১খ্রি.-৮৫২হি./১৪৪৯খ্রি.), ফাতহুল বারী ফী শারহি সাহীহিল বুখারী, আল-মাত্ববা‘আস সালাফীয়্যাহ ওয়া মাকতাবাহা, কায়রো-মিসর; ২০১৫খ্রি., খন্ড-০৬, পৃ.নং-১০২।)

ইমাম আযম (রা.)-এর ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর ওস্তাদ বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (১১৮হি./৭২৬খ্রি.-১৮১হি./৭৯৭খ্রি.) আল-মারওয়াজী (রা.আ.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মু‘য়াবিয়া বিন আবী সুফিয়ান (রা.) এবং ওমার ইবনু আব্দুল আযীয (রাহ.) এর মধ্যে কে উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, “আল্লাহর কসম! রাসূল (সা.)-এর সাথে চলতে গিয়ে হযরত মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর নাকের ভিতর যে ধুলা ঢুকেছিল, সে ধুলা ওমার ইবনু আব্দুল আযীয থেকে হাজার বার উত্তম। এই সেই মু‘য়াবিয়া (রা.) যিনি রাসুল (সা.)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছিলেন। যখন রাসূল কারীম (সা.) বলেছিলেন, সামি‘আল্লাহু লি-মান হামিদাহ, তখন মু‘য়াবিয়া (রা.) পেছন থেকে) বলেছিলেন, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। এরপর আর কী কথা থাকতে পারে? (সূত্রঃ আহমদ ইবনু মুহাম্মদ, ইবনু খল্লিক্বান (৬০৮হি./১২১১খ্রি.-৬৮১হি./১২৮২খ্রি.), ওয়াফিয়াতুল আ‘ইয়ান ওয়া আনবা‘উ আবনায়িয যামান, দারুস সাদির, বৈরুত-লেবানন; ২৭ নভেম্বর-২০১১খ্রি.,খন্ড-০৩, পৃ.নং-৩৩।)

সিরিয়ার আমীর হিসেবে অত্যন্ত সফলতার পরিচয় দিয়ে তিনি ইতঃপূর্বে খুলাফা-এ রাশেদার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলিফার সুনজরে ছিলেন। অসাধারণ নৈপুণ্যের কারণে হজরত ওমার ইবনু খাত্তাব (৪০হি.পূ./৫৮৪খ্রি.-২৩হি./৬৪৪খ্রি.) (রা.) তাঁর খিলাফতকালে তাঁকে দামেস্কের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। হজরত ওসমান (রা.) তাঁকে পুরো শামের (সিরিয়ার) আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি খলিফা হয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনেন। পরিস্থিতি এমন হয় যে, মহিলারা রাতে তাদের ঘরের দরজা খুলে ঘুমাতেও ভয় করতেন না। কোনো ব্যক্তি পথে পড়ে থাকা কারো জিনিস ছুঁয়ে দেখার সাহস পেতেন না। তাঁর শাসনামলে সারা পৃথিবীতে কোনো মুসলমান ভিক্ষুক ছিল না। রাজ্যের অমুসলিম নাগরিকদেরও শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম যোগাযোগের জন্য ডাক বিভাগ, সরকারী দলীল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের জন্য পৃথক বিভাগ, দেহরক্ষী ইউনিট, গুপ্তচর বিভাগ এবং সচিব প্রথা চালু করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে সুশৃঙ্খল রূপ দেন ও ইসলামের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। (সূত্রঃ মুহাম্মদ ইবনু জারীর আত-তিবিরিস্থানী, আবু জাফর আত-তাবারী (২৪৪হি./৮৩৯খ্রি.-৩১০হি./৯২৩খ্রি.), তারীখুল উমাম ওয়াল মূলুক (তারীখে তাবারী), দারুল মা‘আরিফ, মিসর; দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৬৮খ্রি., খন্ড-০৬, পৃ.নং-৮১; ইয়াকূত ইবনু আব্দিল্লাহ আল-হামাভী আল-বাগদাদী (৫৭৪হি./১১৭৮খ্রি.-৬২৬হি./১২২৫খ্রি.), মু‘জামুল বুলদান, দারুস সাদির, বৈরুত-লেবানন; ১৩৯৭হি./১৯৯৩খ্রি., খন্ড-০৪, পৃ.নং-৩২৩; মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আয-যাহাবী, হাফিয শামসুদ্দীন (৬৭৩হি./১২৭৪খ্রি.-৭৪৮হি./১৩৪৮খ্রি.): সিয়ারু আ‘লামীন নুবালা, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, কায়রো-মিসর; ১৪০২হি./১৯৮২খ্রি., খন্ড-০৩, পৃ.নং-১৫৭।)

পর্তুগাল থেকে চীন পর্যন্ত এবং আফ্রিকা থেকে ইউরোপ পর্যন্ত ৬৫ লাখ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চল তাঁর শাসনামলে ইসলামের করতলগত হয়। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর খেলাফতের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সম্পর্কে বিশিষ্ট তাবি‘য়ী ইমাম ক্বাতাদা ইবনু দিআ‘মা আস-সাদূসী (৬১হি./৬৮০খ্রি.-১১৮হি./৭৩৬খ্রি.) (রা.) ও ইমাম মুজাহিদ ইবনু যাবর (২১হি./৬৪২খ্রি.-১০৪হি./৭২২খ্রি.) (রা.) বলেন, ‘তোমরা যদি মু‘য়াবিয়াকে দেখতে তবে, অবশ্যই বলতে ইনিইতো ইমাম মাহদী’। (ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড-০৮, পৃ.নং-১৩৭।)

[1]- আমীর মু‘য়াবিয়া পর এক নজর, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৭। বইটি রচনার পরবর্তী রাত্রে প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে স্বপ্নে দীদার নসীব হয়। নাবীজি হাকিমুল উম্মাতকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “তুমি আমার সাহাবীর সম্মান রক্ষার চেষ্টা করেছ। আল্লাহপাক তোমার সম্মান রক্ষা করবেন”। আল-হামদুলিল্লাহ! (সূত্রঃ আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১২৭।)

[2]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, . পৃ.নং-৩৩৭।

এই বইয়ে গ্রন্থকার শুরুতে একটি ভূমিকা ও তদ্‌সঙ্গে আহলে বায়ত ও সাহাবাগণের মর্যাদা-সম্মান পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে বর্ণনা করার পর দুইটি অধ্যায়- প্রথম অধ্যায়ে হযরত আমীর মু'য়াবিয়া (রা.)-এর জীবনী ও তিনি হুনাইন যুদ্ধের গণীমত প্রাপ্তাবস্থায় "ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী"[১] ছিলেন, না কি পূর্ব হতে মু'মিন ছিলেন সে সন্দেহ নিরসন করেছেন এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত আমীর মু'য়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে আপত্তিসমূহ ও তার দালীলিক উত্তর প্রদান এবং হযরত আলী মুরতাজা (রা.)-এর বিরোধীতার কারণ কী ছিল তার বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। শেষে একটি পরিশিষ্ট রচনা করে তাতে হযরত আমীর মু'য়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নানা মন্তব্য এবং হযরত আমীর মু'য়াবিয়া (রা.)-এর প্রতি তাঁদের ধারণা কী ছিল তা আলোচনা করে বইটি শেষ করেছেন।[২] 'এই কিতাবের মাধ্যমে গ্রন্থকারের অপূর্ব বিশ্লেষণ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সত্যিই তিনি একজন বড়মাপের গবেষক এবং যুক্তিবিদ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন'।[৩]

বইটি চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা 'মুহাম্মদী কুতুবখানা'-র মালিক অধ্যাপক লুৎফুর রহমান সাহেব-এর বাংলা অনুবাদে "শরীয়তের দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবীয়া" শিরোনামে তার প্রকাশনা হতে ০১ জুলাই-১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[১]- কুরআনের ভাষায় 'মুআল্লাফাতুল কুলুব' অর্থাৎ- যিনি এখনো অমুসলিম। কিন্তু ইসলামের প্রতি দূর্বলতা আছে। ইসলাম গ্রহণে যার অন্তর আগ্রহী হয়ে থাকে। আল-কুরআন, সূরাঃ আত-তাওবাহ-০৯:৬০।

[২]- শাইখ সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদির জিলানী (রা.) বলেন, 'আহলে সুন্নাত অল জামাতের সুপ্রসিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যাপার নিয়া সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে মতপার্থক্য বা মতেভেদ দেখা গিয়াছে, সে ব্যাপারে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চুপ থাকিবে। কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবে না। সাহাবদের প্রতি কোনরূপ অশোভন উক্তি প্রয়োগ না করিয়া শুধু তাঁহাদের ফযীলত ও গুণাবলীর চর্চা করিবে'। (সূত্রঃ আব্দুল কাদির আল-জিলানী, সৈয়্যদ (৪৭০হি./১০৭৮খ্রি.-৫৬১হি./১১৬৬খ্রি.), গুণিয়াতুত্ ত্বালেবীন (বাংলা অনুবাদঃ এ. এন. এম. ইমদাদুল্লাহ), বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ-১৯৯৬ইং, পৃ.নং-৮৩।

[৩]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩৩৭।

ইসলাম কী চার উসূলী ইস্তিলাহীঁ

(اسلام کی چار اصولی اصطلاحیں)

ইসলামের চারটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের তাত্ত্বিক আলোচনা স্থান পেয়েছে এই বইয়ে। শব্দ চতুষ্টয় হলো- ইলাহ, রাসূল, নাবী ও ঈমান। জামাতে ইসলামী-পকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জনাব সৈয়দ আবুল আ'লা মাওদুদী 'কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তিলাহীঁ' গ্রন্থে- ইলাহ, রব, ইবাদত এবং দ্বীন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 'ইলাহ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, 'যদি আমি অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে ডাকি তবে, এর উপর দো'আ শব্দ আরোপ হয় না। আর না এর অর্থ সেবক হয় বা ডাক্তারকে 'ইলাহ' বানানো হয়েছে। কেননা, এসবই ধারাবাহিক কর্ম-কারণের অন্তর্ভূক্ত। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু আমি পিপাসার্তবস্থায় সেবক বা ডাক্তারকে ডাকার পরিবর্তে কোন ওয়ালী বা কোন দেবতাকে ডাকি তাহলে অবশ্যই তাদের 'ইলাহ' সাব্যস্ত করা হলো এবং তাদের থেকে সাহায্য চাওয়া হলো'।[১]

কিন্তু শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর 'তাফসীর-এ আযীযী' গ্রন্থে বলেন, 'আল্লাহপাকের স্বভাবগত কর্ম যেমন, সন্তান দেওয়া, রিযিক বৃদ্ধি করা, রোগাক্রান্তকে শিফা দেয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহকে মুশরিকরা দেব-দেবীর প্রতি সম্পর্কিত করে থাকে বিধায় কাফির হয়ে যায়। আর তাওহীদবাদীরা আল্লাহপাকের নামের বদৌলতে বা তাঁর সৃষ্ট ঔষধ বা তাঁর প্রিয় সৎকর্মশীল বান্দাগণের দো'আর প্রতিফল মনে করে যাঁরা আল্লাহর দ্বারে আবেদন জানিয়ে সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণ করে থাকে; এই বিশ্বাস হেতু তাদের ঈমানে কোন প্রকার ক্ষতি হয় না'।[২] কোন মুসলমান নাবী, ওয়ালী এবং ফিরিশতাকে সবকিছুর প্রত্যবেক্ষক এবং মৌলিক ক্ষমতা প্রয়োগকারী মনে করে না; যা জনাব মাওদুদী সাহেব মনে করেছেন। কেননা, ওয়ালী ও নাবীগণ আলাইহিমুস সালামের ক্ষমতা প্রয়োগের যোগ্যতা খোদাপ্রদত্ত। এস্থলে জনাব মাওদুদী সাহেবের মহা ভ্রষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে।[৩]

শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী'র তাফসীরের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জনাব মাওদুদী সাহেবের তাফসীর মাকড়শার জালের মত কমজোর। তিনি 'ইলাহ' শব্দের কুরআনিক অর্থ যা কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা মু'মিনদের জন্য ব্যবহার করেছন। অথচ কুরআনিক ভাষায় 'ইলাহ' শব্দের অর্থ হলো- ইবাদতের অধিকারী বা মাবুদ (উপাস্য)। হাকীমুল উম্মাত এর বাইরে 'অদৃশ্য জ্ঞানধারী', 'হাযির-নাজির', 'ছেলে সন্তান দানকারী', 'শিফা দানকারী', 'বিপদ দূরকারী', 'প্রয়োজন পূরণকারী', 'আবেদন-নিবেদন মঞ্জুরকারী', 'দূর হতে শ্রবণকারী-অবলোকনকারী' এবং 'জগতের উপর ক্ষমতা প্রয়োগকারী'র মতো অর্থসমূহকে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন এই গ্রন্থে।[৪] কেননা, উপরিউক্ত অর্থসমূহ গ্রহণ করা হলে- পবিত্র কুরআন মতেই 'অসংখ্য ইলাহ' হয়ে যাবে। নাউযুবিল্লাহ! কেননা, হযরত ঈসা (আ.)-এর অদৃশ্যজ্ঞান সম্পর্কে কুরআন সাক্ষী, হযরত সুলায়মান (আ.)-কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ ও দূর হতে শ্রবণ করার ক্ষমতার বিষয়ে কুরআন সাক্ষী, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাধ্যমে আরোগ্য দানের ব্যাপারে কুরআন সাক্ষী, হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক ফুঁক দিয়ে সন্তান দেয়ার ব্যাপারে কুরআন সাক্ষী, হযরত আসিফ বিন বরখিয়া (রা.) কর্তৃক পৃথিবীকে হাতের তালুতে দেখার ক্ষমতার ব্যাপারে কুরআন সাক্ষী এবং বিপদ দূর করা, প্রয়োজন পূরণ করা, প্রার্থনা কবূল করার মাসআলা হযরত মারইয়াম (আ.) ও হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনায় কুরআন সাক্ষী।[৫]

---

[১]- আবুল আ'লা মাওদুদী, সৈয়দ, কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তিলাহীঁ, ইসলামী পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, এম শাহ আলম মার্কেট, লাহোর-পাকিস্তান; প্রথম প্রকাশ- ১৯ অক্টোবর-১৯৭৩, পৃ.নং-১৭।

[২]- আব্দুল আযীয দিহলভী, শাহ, তাফসীর-এ আযীযী (উর্দু) জাওয়াহির-এ আযীযী, (অনুবাদ: মাহফুযুল হক কাদিরী, সৈয়্যদ) নূরীয়্যাহ আযীযীয়্যাহ পাবলিকেশন, দাতা গঞ্জবখশ রোড, লাহোর-পাকিস্তান; জুমাদাল উলা-১৪২৯হি./জুন-২০০৮খ্রি., খন্ড-০১. পৃ.নং-৩৩।

[৩]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, , পৃ.নং-৩৫০।

[৪]- আহমদ ইয়ার খান, মুফতী, ইসলাম কী চার উসূলী ইস্তিলাহীঁ (রসায়েলে নাঈমিয়্যাহ), নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; জুন-২০০৬ খ্রি., পৃ.নং-২২৫-২৩৫।

[৫]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩৫১-৩৫৬।

সুতরাং বর্ণিত অর্থসমূহ ‘ইলাহ’ শব্দের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা হাকীমুল উম্মাত আয়াত সমূহ উল্লেখের দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছেন।
বইটি ৫২ পৃষ্টার একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। এটি ১৩৮৪ হিজরী মুতাবিক ১৯৬৪ সালে গুজরাট-পাকিস্তান হতে প্রকাশিত হয়।

এক ইসলাম

(ایک اسلام)

বইটি হাকীমুল উম্মাত-এর সংক্ষিপ্ত রচনাবলীর অন্যতম রচনা। যাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইসলামে হাদীছ শরীফের খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হাদীছ শরীফ ছাড়া কুরআন বুঝা অসম্ভব। আর কুরআন বুঝা ছাড়া ইসলাম বুঝা ও মানা অসম্ভব। এই বইয়ে রচয়িতা হাদীছ অস্বীকারকারীদের কঠোর প্রতিবাদ শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমে প্রদান পূর্বক বলেন, ‘কুরআন-হাদীছ ইসলামের এমন দুইটি স্তম্ভ যা ছাড়া ইসলাম নামক ঘরের ছাদ টিকবে না’।[১]

এটি রচনার কারণ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মাত বলেন, ‘আমার প্রিয় বন্ধু পীর সৈয়্যদ মা‘সুম শাহ নাওশাহী কাদিরী (র.আ) আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, ইসলামী শরী‘আতে হাদীছ শরীফের প্রয়োজনীয়তার উপর কিছু লেখা প্রয়োজন। কেননা, আজকাল কিছু লোক “কুরআনই যথেষ্ট, হাদীছ মানা অহেতুক” এই বিষয়ে লেখালেখি করে মুসলমানদের ঈমানের উপর বজ্রপাত করছে। আমি বন্ধুবরের অনুরোধে অল্প কিছু লিখলাম। ইন শা-আল্লাহ! প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা হবে। এই বইয়ের দু’টি পরিচ্ছেদ করছি। প্রথম পরিচ্ছেদে হাদীছ শরীফের প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ উপস্থাপন করবো। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হাদীছ শরীফের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তিসমূহের জবাব প্রদান করবো’।[২]

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে লেখক প্রমান করেছেন যে, কুরআন-হাদীছ বাহ্যত দুইটি বিষয় মনে হলেও মূলত এক। কেননা, দুইটি মিলেই ইসলাম বা ইসলামী জীবনব্যবস্থা। কুরআন যেভাবে ওয়াহী (আসমানী প্রত্যাদেশ) তেমনি হাদীছ শরীফও আল্লাহর বাণী। হাদীছ শরীফ ছাড়া ইসলামী শরী‘আত অচল। লেখক এই পুস্তিকাটি ০৫ রবিউল আখির-১৩৭৫ হিজরীর জুমাবারে রচনা করেন।

এটি কুতুবখানা নাঈমিয়্যাহ, লাহোর-পাকিস্তান হতে তারিখ উল্লেখ ব্যতিত শাহযাদা মুফতী ইক্তেদার আহমদ খান নঈমী’র তত্ত্বাবধানে (রাসাইল-এ নাঈমিয়্যাহ) ভূক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। পরে তারিখ উল্লেখ ব্যতিত ‘আ‘লা হযরত নেটওয়ার্ক’ নামীয় প্রকাশনা সংস্থা হতেও স্বতন্ত্র রিসালাহ হিসেবেও প্রকাশ করা হয়।

---

[১]- ঐ, পৃ.নং-৩৪৭।

[২]- এক ইসলাম (রাসাইল-এ নাঈমিয়্যাহ), পৃ.নং-২০৫।

আল-কালামুল মাকবূল ফী ত্বাহারাতি নাসবির রাসূল

(الكلام المقبول في طہارت نسب الرسول)

পুস্তিকাটি প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সম্পর্ক, তাঁর বংশের মর্যাদা বিষয়ে সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ এবং এতদ্‌বিষয়ে বাতিল দৃষ্টিভঙ্গি ও আক্বীদার জন্য উচ্চমানের প্রতিউত্তর। এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করলেন, যদি আল্লাহর নিকট মুত্তাকী লোকই সম্মানিত হয় থাকে তবে, বংশের গুরুত্ব কোথায়? সকল বংশের মর্যাদা কি এক? এর উত্তর প্রদানের নিমিত্তে শরয়ী‘ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনার মাধ্যমে বিশদ দলীল সহকারে ‘আহল-এ বায়ত-এ রাসূল’-এর সম্মান-মর্যাদা বর্ণনা করে কালের এক বিশাল চাহিদা পূরণ করেছেন গ্রন্থকার।[1] বইটি ‘হাক্বীক্বাতুন নাসাব’ নামে সুপ্রসিদ্ধ। এই ফতোয়ার সারমর্ম হলো-‘জগতে রাসূল বংশই সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ এবং তাঁর মু‘মিন সন্তানরাই শ্রেষ্ঠ সন্তান’। আল্লাহপাক রক্ষা করুন! যদি কোন সৈয়্যদ দাবীদার কাফির বা মুরতাদ হয় তাহলে সে বংশ কর্তিত হবে। কেননা, ধর্ম পরিবর্তনের দ্বারা বংশীয় সম্পর্ক নষ্ট বা শেষ হয়ে যায়।[2] ইমাম সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ আস-সাজাওয়ান্দী (ওফাত প্রায়-৬০০হি./১২০৪খ্রি.) আল-হনাফী (র.আ.)[3] তাঁর ‘কিতাবুল ফরায়িজ’ গ্রন্থে বলেন, মৃতব্যক্তির ওয়ারিশ চার কারণে সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। তৃতীয় নাম্বার হলো-ধর্ম পরিবর্তন হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ- মৃতব্যক্তি বা তার ওয়ারিশ উভয়ের যে কেউ একজন ‘মুরতাদ’ হয়ে যাওয়া।[4] সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, সম্পদ হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হলো- বংশীয় সম্পর্ক নষ্ট হওয়া।

বইটিতে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের ধরণ মাথায় রেখে বিজ্ঞ লেখক কর্তৃক প্রথমে ১১টি আয়াত-এ কারীমা, ০৮টি হাদীস-এ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ০৫টি আকলী (যুক্তিগত) দলীল সহকারে উত্তর প্রদান পূর্বক প্রশ্ন কর্তার আপত্তি সমূহেরও উত্তর প্রদান করা হয়েছে। শেষে পরিশিষ্ট ও কিছু জরুরী নির্দেশনা প্রদান পূর্বক বইটি সংক্ষিপ্তভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে।

এই পুস্তিকাটি ‘মাকতাবায়-এ আনোয়ারে মদীনা, হায়দারাবাদ-এর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল ক্বাদির হুসাইনী নূরানী পাশার ভূমিকাসহ তাঁর প্রকাশনা সংস্থা হতে ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ জিল্‌লুর রহমান হাবীবীর অনুবাদে বাংলা ভাষায় ‘নবী বংশের পবিত্রতা’ শিরোনামে চট্টগ্রাম-রাউজান, গশ্চি হাবিবীয়া দরবার শরীফ হতে জিলক্বদ-১৪৩৩ হিজরী মুতাবিক ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

---

[1]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, , পৃ.নং-৩৪৩।

[2]- ঐ।

[3]- তাঁর জন্ম-মৃত্যু সন নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তিনি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ/সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি বা সাতশত হিজরী শতাব্দীর মধ্যেই ইন্তেকাল করেন। ইমাম খায়রুদ্দনী যারকালী (র.আ.)-এর ‘আল-আ‘লাম’ গ্রন্থের সপ্তম খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠার সূত্রে উইকিপিডিয়া (আরবী)তে তাঁর জন্ম-মৃত্যু সন ৮১৯খ্রি.-৮৯৩খ্রি. দেখানো হয়েছে।

[4]- মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ আল-হানাফী, সিরাজুদ্দীন আস-সাজাওয়ান্দী (ওফাত-৬০০হি./১২০৪খ্রি.), কিতাবুল ফরায়িজ (সিরাজী), এমদাদীয়া লাইব্রেরি, চকবাজার-ঢাকা, বাংলাদেশ; তাবি, পৃ.নং-০৭।

রিসালা-এ নূর

(رسالہ نور)

এই বইটি হাকীমুল উম্মাত-এর গবেষণালব্ধ পুস্তিকা; যাতে গ্রন্থকার দলীলের আলোকে 'নূর' প্রসঙ্গের মাসআলাটি উপস্থাপন করেছেন। সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, "হুজুর আকরাম নূর-এ মুজাস্‌সাম" অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় হাবীবের দেহ মুবারক নূরের তৈরি।

বইটি রচনার কারণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেন, প্রিয় নাবী হুজুর মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'নূর' দ্বারা সৃষ্টি বিষয়ে ইতোপূর্বের সকল কালিমা পাঠক মুসলিম দাবীকারী হক সমাজ ঐক্যমত ছিল। এমনকি দেওবন্দী ওলামা সমাজেরও এই আক্বীদা ছিল। মৌলভী আশরাফ আলী থানভী তার 'নশরুত ত্বীব ফী যিকরিল হাবীব' এবং 'সালজুস সুদুর' নামক কিতাবদ্বয়ে নাবীজি নূর হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। সাথে সাথে শাহ আব্দুর রহীম দেহলভী যিনি শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভীর পিতা ছিলেন তিনি তাঁর 'আনফাসে রহীমিয়্যা'তে, মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী তার 'মনসবে ইমামত' কিতাবে, মৌলভী রশীদ আহমদ গঙ্গোহী তার 'এমদাদুস সুলুক' গ্রন্থের ৮৫ ও ৮৬ পৃষ্ঠায় নাবীজি 'নূর' হওয়ার ব্যাপারে আক্বীদা পেশ করেছেন। এতদ্প্রসঙ্গে মৌলভী হুসাইন আহমদ মাদানী তার 'আশ-শিহাবুস সাক্বিব' নামক গ্রন্থে নিজের এবং সমস্ত দেওবন্দী আলেমগণের আক্বীদার প্রকাশ ঘটিয়ে বলেন, "আমাদের সম্মানিত পূর্বজদের উক্তি ও আক্বীদার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ঐ সকল হযারাত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সার্বক্ষণিকের জন্য আল্লাহপাকের করুণা প্রাপ্তির মাধ্যম এবং অফুরন্ত দয়ার ভান্ডার হওয়ার আক্বীদা নিয়ে বসে আছেন। তাদের বিশ্বাস এই যে, অনাদিকাল ধরে যতো দয়া-করুণা বর্ষিত হয়েছে, হবে তা সবই- হোক সকল অস্তিত্বশীল সৃষ্টির উপর বা অনস্তিত্বশীল বস্তুর উপর; সব কিছুর উপর তাঁর যাত পাক এমনভাবে সম্পৃক্ত যেন প্রথমে রবির কিরণ চাঁদের নিকট আসে। চাঁদ হতে হাজারো আরশিতে প্রতিফলিত হয়। মোটকথা, 'হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' জগৎসমূহের সকল পূর্ণতা প্রাপ্তির মাধ্যম। আর এই অর্থই لولاك لما خلقت الأفلاك- أول ما خلق الله نورى- أنا نبى الأنبياء- এই তিন হাদীছ শরীফ হতে প্রতিভাত হয়েছে"।[১]

এতটুকু আলোচনান্তে হাকীমুল উম্মাত বলেন, হুজুর আলাইহিস সালাম 'নূর' হওয়ার আরো অনেক দলীল দেয়া যায়। আমি এতটুকুতেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। কেননা, মান্যকারীর জন্য এটুকুই যথেষ্ট। অমান্যকারীর জন্য অগুণতি দলীলও যথেষ্ট নয়।[২]

নাবীজির নূরকে অস্বীকার করা মানে কুরআনের আয়াত ও হাদীছ শরীফকে না মানা। বিজ্ঞ লেখক হুজুর আলাইহিস সালাম-এর 'নূর' হওয়া পবিত্র কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করেছেন। সাথে সাথে বিজ্ঞ সাহাবা-সালফে সালেহীন (পূর্ববর্তী হক ওলামা সমাজ)-এর লেখনী-উক্তি-বিশ্বাস দ্বারাও প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপাদমস্তক 'নূর'।

এই পুস্তিকাটি দুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে- 'নূর' বিরোধীদের আপত্তির প্রতিরোধ তাদের অগ্রগণ্য মুরুব্বিদের উক্তি হতে খুবই সুন্দরভাবে করেছেন। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে- 'নূর' বিরোধীদের প্রশ্নসমূহের উত্তর এমন পদ্ধতিতে প্রদান করেছেন যে, তাদের প্রশ্নই যেন একটি উত্তর। সুবহানাল্লাহ!

বইটি 'রাসাইল-এ নাঈমীয়্যাহ' শিরোনামে অন্তর্ভূক্ত হয়ে নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান হতে প্রকাশিত হয়। 'বিশ্বনবী (দ.) নূর হওয়ার প্রমাণ' শিরোনামে বাংলা অনুবাদ করেন শায়খ খন্দকার গোলাম মাওলা নক্‌শেবন্দী। এটি ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[১]- আহমদ ইয়ার খান নঈমি, মুফতী, রিসালা-এ নূর (রাসাইল-এ নাঈমিয়্যাহ), নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; তারিখ বিহীন, পৃ.নং-৬১-৬৫।

[২]- ঐ, পৃ.নং-৬৫।

রহমত-এ খোদা ব-উসীলা-এ আউলিয়া আল্লাহ

(رحمت خدا بوسیلۂ اولیاءاللہ)

‘উসীলা’ সংক্রান্ত মাসআলাটি ইসলামী শরী‘আতে পাদপ্রদীপের ন্যায় সুস্পষ্ট একটা বিষয়। কিন্তু বর্তমানকালে কিছু শ্রেণির আলিম এই মাসআলাকে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করেছে। ইসলামী জগতে শাইখ আহমাদ ইবনু তাইমিয়া আল-হার্‌রানী আল-হাম্বলী (৬৬১হি./১২৬৩খ্রি.-৭২৮হি./১৩২৮খ্রি.) নাবী-ওলী’র উসীলাকে সর্বপ্রথম অস্বীকার করে বলেছে- ‘যতবড় বিষয়ই হোক না কেন শুধুমাত্র নিজের ঈমান-আমলের উসীলা দিয়ে প্রার্থনা কর’।[১] অথচ শাইখ ইবনু তাইমিয়া একই গ্রন্থে হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক হযরত আব্বাস (রা.) এর উসীলা নিয়ে দোয়া করা প্রসঙ্গে বলেন- اقره علیه جمیع الصحابة لم ینکر علیه احد مع شهرته وهو من اظهر الاجماعات الاقرارية ودعا بمثله معاوية بن ابى سفيان فى خلافته- এই উসীলামূলক প্রার্থনা সকল সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) স্বীকৃতি দিয়ছেন। এই দো‘আ এতই সুপ্রসিদ্ধ যে কেউ অস্বীকারও করেনি। এটি সুস্পষ্ট স্বীকৃত ঐক্যমত। এরূপ দো‘আ হযরত মু‘য়াবিয়া (রা.) তাঁর খিলাফতেও করেছিলেন।[২] মূলত এই মাসআলাটি বুঝতে হলে দ্বীনের বড়ই বুঝশক্তির দরকার। সকল নাবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) উসীলা মানতেন। হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.) হতে শুরু করে আমাদের আঁকা ও মাওলা হুজুর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নাবী-রাসূল নিজেরাই ব্যক্তিক উসীলার আশ্রয় নিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ তিন যুগের স্বর্ণালী মানুষেরা, ইমাম-মুজতাহিদ-মুফাস্‌সির-মুহাদ্দিস-সূফীসহ সকল হকপন্থী মুসলমানগণ ‘উসীলা’ মেনেছেন এবং ‘উসীলা’ নিয়ে দো’য়া-প্রার্থনার শিক্ষাও দিয়েছেন।

এই গ্রন্থে হাকীমুল উম্মাত ২২টি পবিত্র কুরআনের আয়াত, ২১টি হাদীছ মুবারক, ৬১টি ওলী-আলিমের উক্তি-উদ্ধৃতি এবং ১০টি উসীলা বিরোধীদের কিতাব হতে প্রমাণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে বুর্যগানে দ্বীনের উসীলাকে শরীয়তসম্মত বিধান বলে সাব্যস্থ করেছেন।[৩]

> এটি ৮০পৃষ্ঠার দুই অধ্যায়ে বিভক্ত একটি ছোট বই। প্রথম অধ্যায়ে উসীলাকে কুরআন-হাদীস-বুযর্গগণের উক্তির মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উসীলা বিরোধীদের সকল আপত্তির দাঁতভাঙ্গা উত্তর দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞ লেখক এই বইয়ে ‘উসীলা’ প্রসঙ্গটি প্রশ্নোত্তর আকারে লেখার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা বিরল-অভূতপূর্ব পদ্ধতি। ‘উসীলা’ বিরোধীগণ তাদের দাবীর পক্ষে কুরআনের যে আয়াত[৪] উল্লেখ করে থাকেন তার ব্যাপারে গ্রন্থকার লিখেছেন, “এই আয়াতের সাথে মুসলমানের কোন সম্পর্কই নেই। এই আয়াত কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আর যে আয়াত কাফিরের ব্যাপারে অবতীর্ণ তা মুসলমানদের ব্যাপারে ব্যবহার করা পথভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়”! মূলত ‘উসীলা’ বিরোধীদের আপত্তি মাকড়শার নাজুক জালের মত। তিনি মুসলমানদের জন্য উসীলার ব্যাপারে বলেন, ‘যে ব্যক্তি

---

[১]- আহমদ ইবনু তাইমিয়া, শাইখুল ইসলাম (৬৬১হি./১২৬৩খ্রি.-৭২৮হি./১৩২৮খ্রি.): ক্বাঈদাতুল জালীলাহ ফীত্-তাওয়াস্‌সুলি ওয়াল ওয়াসীলা, ইদারাতুল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, রিয়াদ-সৌদি আরব; ১৪২০হি./১৯৯৯খ্রি., পৃ.নং-১৩১।

[২]- মুহাম্মদ শরফ আল-কাদেরী, আল্লামা, মুফতি, ইসলামী শরীয়াতে উছিলা, (অনুবাদ: জসিম উদ্দীন আল-আযহারী, মাওলানা, মুহাম্মদ,) অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৫ শা’বান-১৪৩৬ হিজরী, ২০ জ্যৈষ্ঠ-১৪২২ বঙ্গাব্দ, ৩ জুন-২০১৫ ইংরেজি, পৃষ্ঠা-৪৪।

[৩]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, , পৃ.নং-৩১৭।

[৪]- আল্লাহপাক বলেন, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ অর্থাৎ- “তুমি কি জান না যে, নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহর? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই”। আল-কুরআন, সূরা: আল-বাক্বারাহ, ০২:১০৭।

প্রশান্তহৃদয়[১] (মু‘মিন) ছাড়া কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে সম্পদ-সন্তান তার কোন কাজে আসবে না। কিন্তু মু‘মিনের জন্য সন্তান-সম্পদ সবকিছু কাজে আসবে’। যারা ঈমানদার নয় তাদের জন্য বন্ধুত্ব-সুপারিশ কিছুই কাজে আসবে না।

তিনি আরো বলেন, “কবরেও ‘উসীলা’ ছাড়া কোন সফলতা আসবে না। কেননা, কবরে আমলের প্রশ্ন করা হয় না। আমলের প্রশ্ন হবে কিয়ামতের ময়দানে। কবরের তিন প্রশ্নই আক্বীদা সংক্রান্ত। তন্মধ্যে শেষ প্রশ্ন রাসূল পরিচিতি প্রসঙ্গে হবে। আর এই প্রশ্নের উপরই পুরস্কার-তিরস্কারের ফয়সালা হবে। সঠিক উত্তরদাতার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষণা আসবে- “আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাত-এর দরজা খুলে দাও” ।[২] সুতরাং জান্নাত-এ যাওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিচিতি তথা উসীলার মাধ্যমে হবে। সুবহানাল্লাহ! মুল্লা রুমী বলেন,

اے بادر گور خفتہ خاک دار*بہ زصد احیا بنفع وانتشار
سایہ اونبود وخاکش سایہ مند*صدہزاراں زندہ درسایہ وے اند-

অর্থাৎ- ‘অনেক কবরবাসী বান্দা হাজারো জীবিতের চেয়ে বেশি উপকার দিতে পারেন। তাঁদের কবরের মাটিও লোকজনের উপর ছায়া দিয়ে থাকে। অসংখ্য জীবিত ঐ কবরবাসীদের ছায়ায় রয়েছে’।

মৌলভী আশরাফ আলী থানভী বলেন,

তুমিও যদি না নাও খবর এই অসহায় উম্মতের,
তবে বলো- যাব কোথায়? হে রাসূল রাহমতের!
উভয় তলে তুমিই মম একমাত্র উছিলা-কান্ডারী।
চিন্তায় যদিও ব্যথিত আমি, বাহক তোমার ঝান্ডারী।
তোমার মত দাতা-ত্রাতা যার আছে হে রাসূল!
পাপী-তাপী সৈন্য দলের নেই তার ভয়-আকুল।
যেথায় থাকি চাইযে সদা তোমার সরণ ও মদদ
নেই প্রয়োজন এরচেয়ে বেশী কিছু হে প্রিয় রাসূল![৩]

এই বইটি ০১ রবিউল আখির ১৩৭১ হিজরী রোজ: সোমবার রচনা করা হয়। তারিখ উল্লেখ ব্যতিত ‘আ’লা হযরত নেটওয়ার্ক’ নামীয় প্রকাশনা সংস্থা হতে বইটি প্রকাশিত হয়। ‘আওলীয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত’ শিরোনাম দিয়ে চট্টগ্রাম সোবহানিয়া আলীয়া মাদরাসার শাইখুল হাদীছ আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মুঈনদ্দীন আশরাফী সাহেব-এর বাংলা অনুবাদ মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-এর মালিক অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান ০১ জানুয়ারি ১৯৯০ সালে প্রথম প্রকাশ করেন। সর্বশেষ ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৫ জানুয়ারি ২০০৮ সালে হয়।

---

[১]- আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي অর্থাৎ- “ওহে প্রশান্তহৃদয়! সন্তুষ্টচিত্তে সাড়াদিয়ে তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি ফিরে এসো এবং আমার প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে আমার জান্নাতে প্রবেশ কর”। আল-কুরআন, সূরা: আল-ফাজর, ৮৯:২৭,২৮,২৯।

[২]- আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, রহমত-এ খোদা ব-উসীলায়-এ আউলিয়া আল্লাহ, আ’লা হযরত নেটওয়ার্ক, তারিখ বিহীন, পৃ.নং-৩৭,৩৮; বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, , পৃ.নং-৩১৯।

[৩]- মুহাম্মদ শরফ আল-কাদেরী, আল্লামা, মুফতি, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৬৩।

শান-এ হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল কুরআন

(شان حبیب الرحمن من آیات القرآن)

পবিত্র কুরআন কারীমের আলোকে প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শান-মান বর্ণনায় এই গ্রন্থটি একটি চমৎকার ও পাঠক মহলে সাড়া জাগানো বই। 'মসজিদে গুলজারে মদীনা'-এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক পীর-এ তরীক্বত আল্লামা হাজী তোরাব আক্বদাম আহমদ সাহেব (হাজী মুহাম্মদ আলী সাহেব নামে পরিচিত) হাকীমুল উম্মাত-এর নিকট আবেদন করে বলেন, "আপনি এমন একটি বই লিখুন যাতে কুরআন কারীমের ঐ আয়াত সমূহ থাকবে যাতে শুধুমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শান-মান বর্ণনা করা হয়েছে। আর এর উদ্দেশ্য সমূহকে সংক্ষিপ্তরূপে এমনভাবে বর্ণনা করবেন যাতে মুসলমানদের অন্তর ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যায়, শানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানদারগণের বুঝা হয়ে যাবে। যা পাঠ করার ফলে মু'মিনের অন্তর খুশীতে ভরপুর, চোখ আলোকিত হবে এবং ইসলাম বিরোধীরা রাসূল অতুলের ঐ মর্যাদাসমূহ দেখে তাঁর কদমে চলে আসবে"।[১] হাজী সাহেব-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন।

এই বইয়ে হাকীমুল উম্মাত ১০২টি কুরআন মাজীদের আয়াত দিয়ে সাব্যস্ত করেছেন যে, পুরো কুরআন মাজীদই 'না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'। বইটির শুরুতে বিজ্ঞ লেখক আল্লাহপাক প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে বৈশিষ্ট্য ও অনিঃশেষ পূর্ণতা দিয়েছেন তা গণনা করা যাবে কি না তার ব্যাপারে এক চমকপ্রদ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন-

আল্লাহপাক দুনিয়ার বস্তু সম্পর্কে বলেন, "হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি বলুন! দুনিয়ার ভোগ্যবস্তু তো সামান্যই মাত্র"।[২] ভোগ্যবস্তু সামান্য বলা সত্ত্বেও এই বস্তুকে কেউ আজো গণনা করতে পারেনি। কেননা, "যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো তবে, তা গণনা করতে সক্ষম হবে না"।[৩] আর মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন, "(হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!) আপনিতো সুমহান চরিত্রের অধিকারী"।[৪] সুতরাং সমস্ত মানবজাতি মিলে যেখানে দুনিয়ার সামান্য ভোগ্যবস্তু গণনা করতে অক্ষম সেখানে (আজীম) সুমহান চরিত্রধারী সত্ত্বার মান-মর্যাদা গণনা করার সাধ্য রয়েছে কার?[৫]

বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো,

- পবিত্র কুরআনের পরতে পরতে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে প্রশংসাগীতি আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র জবানে করেছেন তা হৃদয়গ্রাহী ও সাধারণবোধগম্য ভাষায় হাকীমুল উম্মাত এই বইয়ে উপস্থাপন করেছেন। স্রষ্টা তাঁকে যে শান-মান-ইজ্জত দিয়েছেন তা যেন উম্মাত বুঝতে পারে। একত্ববাদী আল্লাহ তাঁর রাসূল অতুলকে প্রত্যেক গুণাবলীর মধ্যে যে পূর্ণতা দিয়েছেন তা অনুপমই দিয়েছেন এবং তাঁকে অতুলনীয় করে সৃষ্টি করেছেন তার সুন্দর পরিস্ফুটন ঘটেছে এই গ্রন্থে।
- প্রত্যেক আয়াত চাই তা তাওহীদ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হউক, পূর্ববর্তী নাবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতদের ব্যাপারে হউক, কাফির-মুশরিকের ব্যাপারেই হউক অথবা বিধি-বিধান বিষয়ক হউক না কেন সবই

---

[১]- আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, শান-এ হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল কুরআন, মাকতাবাহ ইসলামীয়্যাহ, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; তারিখ বিহীন, পৃ.নং-১৯।

[২]- আল-কুরআনুল কারীম, সূরাঃ আন-নিসা, ০৪:৭৭।

[৩]- আল-কুরআনুল কারীম, সূরাঃ ইবরাহীম, ১৪:৩৪।

[৪]- আল-কুরআনুল কারীম, সূরাঃ আল-কলম, ৬৮:০৪।

[৫] - সফদর আলী ক্বাদিরী, ড., তা'রুফ-এ কিতাব শান-এ হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল কুরআন (উর্দূ প্রবন্ধ), সূত্র: https://www.nafseislam.com/articles/taruf-kitab-shane-habib-ur-rehman

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুমহান মর্যাদাই প্রকাশ করে তার দালীলিক বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন, ‘৩৬০ পৃষ্টার বইটি ০৮ জমাদিউল আউয়াল ১৩৬১ হিজরী মুতাবিক ০৩ জুন ১৯৪২ সালের বৃহস্পতিবার রচনা শুরু করি এবং ০৩ শাবান ১৩৬১ হিজরীর সোমবার দিন রচনা শেষ হয়’।[1] এটি প্রথমবার মাকতাবায়ে ইসলামীয়্যাহ, ৪০-উর্দূ বাজার, লাহোর হতে ১৩৬১ সালেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার দ্বিতীয় প্রকাশকালে এতে আরো বৃদ্ধি করেছেন। ১৪ মুহার্‌রাম ১৩৬৫ সালে অতিরিক্ত সংযোজন শেষ হয়।[2]

বইটি ‘শানে হাবীবুর রহমান’ শিরোনামে বাংলা অনুবাদ করেন অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর। ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনী হাজীপাড়া, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম হতে বইটি সর্বপ্রথম ১ জুলাই-১৯৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। অনুবাদ গ্রন্থটি ১ মে-২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট এগারবার প্রকাশিত হয়েছে।

---

[1]- শান-এ হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২৮৩।

[2]- ঐ, পৃ.নং-৩১৫।

সালতানাত-এ মুস্তফা দর মামলাকাত-এ কিবরিয়া

(سلطنت مصطفٰے در مملکت کبریا جل و علا)

এই বইটি হাকীমুল উম্মাত-এর অভিনব রচনা। এতে তিনি জগৎসমূহের একক স্রষ্টা আল্লাহপাক-এর রাজত্বে হুজুর আঁকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাদশাহীয়তের প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এতে তিনি তাঁর লেখার বিষয়বস্তুর স্বপক্ষে এতই মনোজ্ঞ দলীলের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন; যার মাধ্যমে মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান মর্যাদার শিক্ষা দিয়ে ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.আ.) (৫৪৩/৫৪৪হি./১১৪৯/১১৫০খ্রি.-৬০৪/৬০৫হি./১২০৯/১২১০খ্রি.)-এর চিন্তাকে এবং ইমাম আবূ হামিদ গাজ্জালী (৪৫০হি./১০৫৮খ্রি,-৫০৫হি./১১১১খ্রি.)-এর অনুভূতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বইটির শেষে লেখক কর্তৃক তাঁর পীর-মুর্শিদ সদরুল আফাযীল আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.আ.)-এর দীর্ঘজীবনের জন্য দো'আ চাওয়া হতে বুঝতে পারি এটা সদরুল আফাযীলের জীবদ্দশায় লিখিত হয়। তাঁর ইন্তেকাল ০৮ জিলহজ্ব ১৩৬৭ হিজরী মুতাবিক ১৯৪৮ সালে হয়। এই বইটিও এর পূর্বে রচিত হয়। কিন্তু হালাতে জিন্দেগী প্রণেতা শাইখ বিলাল আহমদ সিদ্দিকী বলেন, বইটি ৬৮ পৃষ্ঠার একটি ছোট বই; যার রচনা ২২ জিলক্বদ ১৩৫২ হিজরী রোজঃ রবিবার করা হয়।[১]

বইটি হাফেজ মাওলানা মঈনুল ইসলাম[২] কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে মুহাম্মদী কুতুব খানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম হতে জুন-১৯৭০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। আমার জানামতে বাংলা ভাষায় এটিই হাকীমুল উম্মাতের প্রথম অনূদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ।

---

[১]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩০৭।

[২]- তিনি তৎকালীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন-বাংলাদেশ-এর উপ-পরিচালক ছিলেন।

ক্বহর-এ কিবরিয়া বর মুনকিরীন-এ ইসমাত-এ আম্বীয়া

(قہر کبریا بر منکرین عصمت انبیاء)

‘ইসমাত-এ আম্বীয়া’[১] মানে নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম মা‘সূম বা নিঃষ্পাপ। তাঁদের কোন পাপ নেই। আল্লাহপাক তাঁদেরকে পাপমুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এটাই ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত’-এর আক্বীদা বা বিশ্বাস, যা যুগ যুগ ধরে মুসলিম মানসে লালিত হয়ে আসছে। পবিত্র কুরআন কারীম-হাদীস-এ রাসূল-ইজমা[২]-ক্বিয়াসের মাধ্যমে এই বিশ্বাস প্রমাণিত এবং সত্যিকারের রাসূল প্রেমিক মুসলিম সমাজের হৃদয়গহীনে সুরক্ষিতও। কিন্তু কোন কোন দেওবন্দী লেখক কর্তৃক তাদের লেখনীর মাধ্যমে নাবীগণ আলাইহিমুস সালামকে অপমান করার দুঃসাহসের কারণে সাধারণ লোকেরা নাবীগণের শান-মান ও আজমতের সাথে বেয়াদবী করার সাহস দেখিয়েছে। যার ফলে ভারতে এমন এক দলের উদ্ভব ঘটেছে যারা নাবীগণকে নাউযুবিল্লাহ! পাপী এমন কি মুশরিক-কাফির পর্যন্ত বলে ফেলেছে। তাদের বিশ্বাস হলো- “ঐ সকল হযারাত নবুয়াতের পূর্বে কাফির-মুশরিক ছিলেন। বড় পাপকারীও (কবীরাহ গুণাহকারী) ছিলেন। পরে তাওবাহ করে নাবী হয়েছেন”। (আল্লাহপাক মাফ করুন!)

এই ঈমান বিধ্বংসী অবস্থা দর্শনে হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) বলেন, ‘আমার নিকট দোয়াত-কলম এবং কিছু কাগজ রয়েছে যা দিয়ে আমি এই বাতিল আক্বীদার অপনোদন করব। আমি গর্ব করছি যে আমার মান-সম্মান এবং মুখ-কলম মহা সম্মানিত রাসূল ও নবীগণ আলাইহিমুস সালাম-এর ইজ্জত-সম্মান রক্ষার ঢাল হয়েছে’।[৩]

‘ক্বহর-এ কিবরিয়া বর মুনকিরীন-এ ইসমাত-এ আম্বীয়া’ বইটি একটি ভূমিকা, দুইটি অধ্যায় এবং ছোট একটি পরিশিষ্টে সমাপ্ত হয়েছে। গ্রন্থকার এতে ০৯টি আয়াত-এ কুরআন, ০৬টি হাদীছ-এ রাসূল, ০২টি ইমামগণের ঐকমত্য ফয়সালা এবং ১০টি জ্ঞানগত (ক্বিয়াস) দলীলের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাষায় ‘নাবী-রাসূল নিঃষ্পাপ’ প্রমাণ করেছেন। এর পর ১৫টি আপত্তির হৃদয় প্রশান্তকারী উত্তর প্রদান পূর্বক পরিশিষ্টে বলেন, ‘নাবী-রাসূলগণ আল্লাহপাকের প্রিয়-নির্বাচিত বান্দা। আল্লাহপাক তাঁদের কৃত উত্তমতার বিপরীত কর্মসমূহকে যেভাবে ইচ্ছা উল্লেখ করতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাদেরকে তাঁদের সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহপাক ঐ সকল দেওবন্দী মৌলভীদের সৎপথের দিশা দিন! তারাই লোকসমাজে নাবীগণ আলাইহিমুস সালামের ব্যাপারে অপপ্রচার করার দুঃসাহস সৃষ্টি করেছে’।[৪]

‘ক্বহর-এ কিবরিয়া’ পুস্তিকাটি ‘আল-ফাক্বীহ’ নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক পর্বে প্রকাশিত হলে তা নাবী-রাসূল প্রেমিক জনসমাজে সাড়া জাগায়। ফলে জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে এটি ‘জা‘আল হক’ তৃতীয় খন্ডের শেষে যুক্ত করে দেয় হয়। ‘জা‘আল হাক্ব’-এর সাথেই এটি বাংলায় এবং ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

---

[১]- শারী‘আতের দৃষ্টিতে ‘ইসমাতুল আম্বিয়া বলতে আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক নাবী-রাসূলগণকে পাপ ও অন্যায় থেকে রক্ষা করাকে বুঝানো হয়েছে। এটি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাঁদের উপর এক বিরাট অনুগ্রহ। তিনি তাঁদেরকে সকল প্রকারের পাপ ও অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আশ‘আরী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, আল্লাহ তা‘আলা বান্দাহ থেকে কোন পাপ সংঘটিত হতে দিবেন না অথবা বান্দার মধ্যে তাঁর অনুগত্যের শক্তি সৃষ্টি করে দিবেন- এটাই হল ‘ইসমত’। (সূত্র: আহমদ আলী, ড., ইসমাতুল আম্বিয়া, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; জুলাই-২০১১/আষাঢ়-১৪১৮/রজব-১৪৩২, পৃ.নং-১১।)

[২]- এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ‘ইজমা’ (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাফসীর-এ রুহুল বয়ান শরীফের সুরা: আশ-শুরা-এর ৫২ নং আয়াতের তাফসীর-এ আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী (১৬৬৩-১৭২৫খ্রি./১১২৭হি.) বলেন, ‘অবশ্যই শরী‘আতের ইমামগণ একমত যে, সকল নাবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম তাঁদের নিকট ওয়াহী আসার পূর্ব হতে মু‘মিন। বড় পাপতো দূরের কথা এমনকি ছোট পাপ, যা মানুষ অপছন্দ করে তা হতেও নাবুয়াত প্রকাশের পূর্বে ও পরে তাঁরা পূত-পবিত্র। কুফুরীর প্রশ্নই তো আসে না’। আহমদ ইয়ার খান নঈমি, মুফতী, ক্বহর-এ কিবরিয়া বর মুনকিরীন-এ ইসমাত-এ আম্বীয়া, ইসলামিক এডুকেশান ডটকম; তারিখ বিহীন, পৃ.নং-০৬।

[৩]- ঐ, পৃ.নং-০১

[৪]- ঐ, পৃ.নং-২৭।

৬. চতুর্থ অধ্যায়:

অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় ইসলামী সাহিত্যচর্চা:

আশরাফুত তাফাসীর (أشرف التفاسير) তাফসীর নাঈমী নামে সুপ্রসিদ্ধ

সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির হাকীমুল উম্মাত আল্লামা আল্‌হাজ্ব মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী বাদায়ূনী আশরাফী (র.আ.) (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.) এর অনবদ্য রচনা হলো 'আশরাফুত তাফাসীর' যা 'তাফসীর নাঈমী শরীফ' নামে সুপ্রসিদ্ধ ও জগৎ বিখ্যাত। পবিত্র কুরআনের অসমাপ্ত ও ১১ খন্ডে বিভক্ত এই তাফসীরটিতে তিনি প্রথম এগার পারার তাফসীর উপস্থাপন করেছেন।[১] এই তাফসীরটি তিনি সোমবার দিন ০৮ রবিউস সানী ১৩৬৩ হিজরীতে শুরু করেন।[২] তৎকালীন উর্দূ ভাষী সাধারণ শিক্ষিত ইসলামী ভাবধারার মুসলমানদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে সহজ-সাবলীল ভাষায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। এটি মুফতী সাহেবের ঊনিশ বছর ব্যাপী 'দারসুল কুরআন' ক্লাসের ছাত্রদের জন্য রচিত নোট সমূহের তাঁর স্বহস্তে সংক্ষেপিত-পরিমার্জিত ও সংশোধিত-সংযোজিত তাফসীর গ্রন্থ।[৩] তিনি তাঁর জীবনের প্রায় সময় তাফসীরের খেদমতে কাঠিয়েছেন। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখক নিজে বলেন, এই তাফসীর গ্রন্থে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে-

১. এটি আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (১৬৫২খ্রি.-১১২৭হি./১৭১৫খ্রি.) রচিত 'তাফসীর-এ রুহুল বয়ান', আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (৫৪৩/৪৪হি.১১৪৯/৫০খ্রি.-৬০৪/০৫হি.১২০৯/১০খ্রি.) রচিত 'তাফসীর-এ মাফাতীহুল গাইব', আল্লামা ইজ্জুদ্দীন আব্দুর রাজ্জাক বিন রিযকুল্লাহ (৫৮৯হি.-৬৬১হি.) রচিত 'তাফসীর-এ আযীযী', আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আন-নাসাফী আল-হানাফী (ওফাত-৭১০হি./১৩১০খ্রি.) রচিত 'তাফসীর-এ মাদারিক' ও ইমাম ক্বাজী আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল আরাবী (৪৬৮হি./১০৭৬খ্রি.-৫৪৩হি./১১৪৮খ্রি.) রচিত 'আহকামুল কুরআন'-এর সারসংক্ষেপ।
২. মূলত এটি উর্দূ তাফসীর সমূহের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ও সবচেয়ে উৎকৃষ্ট তাফসীর সদরুল আফাযীল আল্লামা সৈয়্যদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (র.আ.) (১৩০০হি./১৮৮৩খ্রি.-১৩৬৭হি./১৯৪৮খ্রি.) রচিত 'তাফসীর-এ খাযাইনুল ইরফান' এর বিশদ ব্যাখ্যা।
৩. এই তাফসীর-এ আয়াত সমূহের সরল অনুবাদ পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বিশুদ্ধ উর্দূ অনুবাদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (র.আ.) (১২৭২হি./১৮৫৬খ্রি.-১৩৪০হি./১৯২১খ্রি:. রচিত 'কানযুল ঈমান' হতে চয়ন করা হয়েছে।
৪. প্রত্যেক আয়াতের সাথে তার পূর্ববর্তী আয়াতের যোগ-সূত্র ও সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে।
৫. আয়াতের শান-এ নুযূল সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। শান-এ নুযূলের কয়েকটি বর্ণনার ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে তাত্ববীক (পারস্পরিক মিল) দেয়া হয়েছে।
৬. প্রত্যেক আয়াতের প্রথমে তাফসীর, এরপর তাফসীরের সারমর্ম এরপর সূফীতাত্ত্বিক তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[১] - আসীফ ইকবাল মাদনী, মুহাম্মদ, 'তাফসীর-এ নাঈমী কে তা'আল্লুক ছে এক উলজান কা জাওয়াব' (উর্দূ প্রবন্ধ) মাসিক তাহাফ্‌ফুজ, ফেব্রুয়ারি-২০১৫, করাচী-পকিস্তান; আব্দুল মান্নান, মুহাম্মদ, মাওলানা, কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান (বঙ্গানুবাদ), ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ; ২০০৪ খ্রি., খন্ড-০১, পৃ. নং- ২৭।

[২]- আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৯৩।

[৩]- আহমদ ইয়ার খান নঈমি, মুফতী, আশরাফুত তাফসীর (তাফসীর নাঈমী), ১ম পারা, গুজরাট-পাকিস্তান; মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৬৩ হিজরী, পৃ.নং- ০৪ ও ০৫। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ পাকের অশেষ দয়া ও মেহেরবানীতে ১৯ বছরে প্রথমবার দরসুল কুরআন শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়বার শুরু করা হলো। নতুন দরসের মাঝে অনেক সুক্ষ্ম-উপকারী বিষয় ও নতুন নতুন আপত্তির খন্ডন যা করা হয়েছে তা সবই এতে সংযোজন করা হয়েছে। আল্লাহর করমে এখন এই তাফসীর ভিন্নরকম তাফসীর গ্রন্থে পরিণত হয়েছে'। (সূত্র: ঐ. পৃ.নং-০৬।)

৭. প্রত্যেক আয়াতের সাথে জ্ঞানগত উপকারী নির্দেশনা ও ফিক্বহী মাসায়িল আলোচনা করা করা হয়েছে।

৮. প্রায় সকল আয়াতের অধীনে আর্য, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের এবং নজদী-ওয়াহাবী, কাদিয়ানী, নেচারী (প্রকৃতিবাদী), চাকডালভীসহ অন্যান্য বাতিল ফিরকার আপত্তি সমূহের প্রতিউত্তর বর্ণনা করা হয়েছে।

৯. ভাষা সহজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে, যাতে কঠিন মাসআলা সমূহও সহজে বুঝে আসে।[১]

১০. তাফসীর পরিচিতি, তাফসীর, তাবীল ও তাহরীফের মধ্যে পার্থক্য এবং মৌলভী ও সূফীর পরিচিতি, উভয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট পার্থক্য আর উভয় দলের প্রয়োজনীয়তা ১ম পারার শেষে বিবৃত হয়েছে।[২]

এছাড়া নানা বিজ্ঞজন এর উদার প্রশংসা করেছেন।

১১. বিশিষ্ট গবেষক মৌলভী নজীর আহমদ নঈমী বলেন, 'এই তাফসীর গ্রন্থে তিনি সৈয়্যদুনা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.আ.)-এর 'গিয়ারভী শরীফ'[৩]-এর প্রতি সম্মান রেখে প্রত্যেক আয়াতের জন্য এগারটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে তাফসীর পেশ করেছেন। যেমন, ১.আরবী আয়াত শরীফ ২. নিজের শাব্দিক অনুবাদ প্রদান ৩. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (র.আ.)-এর অনুবাদ সংযোজন ৪. পূর্বাপর আয়াতের সম্পর্ক বর্ণনা ৫. আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা ৬. আয়াতের নাহুভী (ব্যাকরণগত) তাফসীর পেশ ৭. আকলী (জ্ঞানগত) তাফসীর পেশ ৮. আয়াত অবতীর্ণ করণের উপকারিতা বর্ণনা ৯. আয়াত হতে উদ্ভূত ফিক্বহী মাসআলা বর্ণনা ১০. আয়াত সংশ্লিষ্ট উত্থাপিত আপত্তিসমূহের উত্তরদান এবং ১১. সূফীতাত্ত্বিক তাফসীর পেশ করণ।[৪]

১২. বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ড. এস. কে বিলাল আহমদ সিদ্দিকী বলেন, 'জগতে পবিত্র কুরআনুল কারীম-এর অনেক তাফসীর রচিত হয়েছে। কিন্তু যে রীতিতে হাকীমুল উম্মাত তাফসীর লিখেছেন তার উপমা বিরল। তাফসীর কালে তিনি যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তা যেন কুরআন ও হাদীছ পাকের নিক্তিতে তাফসীরকৃত আয়াতের সাথে সর্বোচ্চ মিল রাখে তার প্রতি গভীর ধ্যান ও দৃষ্টি রেখে তাফসীর পেশ করেছেন। তিনি এমন গুঢ় রহস্য ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করতেন যা সাধারণত অন্যান্য মুফাস্সিরগণের তাফসীরে দেখা যায় না। তাঁর উপস্থাপিত অনুবাদ ও তাফসীর-এ কুরআন-হাদীসের মৌলিক ভাবধারাই বিকশিত হতো'।

১৩. কাজী আব্দুন্নাবী কাওকাব বলেন, 'ভারতীয় উপমহাদেশে বেশীভাগ তাফসীর বাতিল মতবাদীদের দ্বারা রচিত হয়েছে। আর এই তাফসীরসমূহ দ্বারা মন্দ আক্বীদার প্রসার এবং বিশুদ্ধ ইসলামী চিন্তা-চেতনা থেকে দূরত্ব তৈরি করা হয়েছে। এই কারণে গ্রন্থকার ইচ্ছা পোষণ করতেন- তিনি এমন একটি তাফসীর রচনা করবেন, যার মাধ্যমে নষ্ট আক্বীদা এবং পথভ্রষ্ট

---

[১]- হাকীমুল উম্মাত নিজে বলেন, 'আমি যখন লিখতে বসি তখন একথা সামনে রাখি যে, আমি ছোট ছেলে-মেয়ে, মহিলা এবং গ্রাম্য ও মুরুভূমির অল্পশিক্ষিত লোকদেরকেই সম্বোধন করছি'। হায়াতে সালিক, পৃ.নং-১০৪।

[২] - পূর্বোক্ত, পৃ.নং.- ০৫।

[৩]- বড়পীর সৈয়্যদ আব্দুল কাদির জিলানী (র.আ.)-এর ওফাত দিবস ১১ রবিউস সানীকে কেন্দ্র করে 'গিয়ারভী শরীফ'-এর প্রচলন ঘটে। যদিও এর সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে শুরু করে অনেক নাবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম-এর এই গিয়ারভী শরীফ সংশ্লিষ্ট আমল রয়েছে। বড়পীর নিয়মিত প্রতি চন্দ্রমাসে 'বারভী শরীফ' তথা ১২ তারিখে পবিত্র মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করতেন। একদিন গাউসেপাক (র.আ.) স্বপ্নের মধ্যে নাবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলেন। নাবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাউসেপাককে লক্ষ্য করে বললেন, "আমার ১২ রবীউল আউয়ালকে তুমি যেভাবে সম্মান করে পালন করে আসছো, আমি এর বিনিময়ে তোমাকে আম্বীয়া কিরাম আলাইহিমুস সালামের গেয়ারভী শরীফ দান করলাম"। মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী, মুহাম্মদ, দান-সদকার ফজিলত ও এগার সংখ্যার বরকত, পৃ.নং.-৫৫-৫৮।

[৪]- নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২২।

করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাধারণ মুসলমানদের রক্ষা করবে’।[১] গুজরাটে এসে তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়। (আল-হামদুলিল্লাহ!)

১৪. তাফসীর নাঈমী’র বঙ্গানুবাদক ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ বলেন, ‘মুফতী সাহেব চূড়ান্ত পর্যায়ের বিষয়বস্তুকেও অতি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য করে দেন। তিনি উচ্চ শিক্ষাগত মানদন্ড ও জ্ঞান-গবেষণার উচ্চমান বজায় রাখার পরিবর্তে নিজের লেখনী ও বর্ণনা উভয়টিকে বিশেষ ও সাধারণ উভয়ধরণের লোকদের একবারে নিকটে নিয়ে এসেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এটাই ছিলো যে, অল্পশিক্ষিত মানুষও তার বর্ণনা বুঝতে সক্ষম হউক। তিনি ইলমে তাসাউফ ও মারিফাতের গুঢ় রহস্য ও ইঙ্গিতগুলোর সুতীক্ষ্ণ মাহাত্ম্যকে পর্যন্ত এক বিশেষ শ্রেণির ইজারাদারী থেকে বের করে সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করে দেন’।[২]

তাঁর তাফসীরের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো- তিনি প্রত্যেক স্থানে আদব এবং চাহিদার কথা মাথায় রেখে তাফসীর করেছেন। তিনি নিজে হাদীছ বিশারদ ও ব্যাখ্যাকারী হওয়াতে তাঁর তাফসীর অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।[৩] এই তাফসীর অন্যান্য তাফসীরের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, হাকীমুল উম্মাতের কলম কোন বিষয়কেই অতৃপ্ত রেখে ছেড়ে যান নি। এটি জ্ঞানগত তাফসীরও আবার সূফীতাত্ত্বিক তাফসীর। তদ্‌সঙ্গে আরেফানাও। সাথে সাথে সহজ-সাবলীল ও সর্বসাধারণের বুঝার উপযোগীও।[৪] হাকীমুল উম্মাতের এই তাফসীর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আউলিয়াগণের দরবারে গৃহীত ও তাঁদের সুদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছে।[৫] এই তাফসীর গ্রন্থে কিছু কিছু আরবী-ফার্সী তাফসীর গ্রন্থের বিষয় যেমন, ইসরাইলী রিওয়ায়েত প্রবিষ্ট করেছেন যা, পাঠককে আন্দোলিত করবে। সাথে সাথে বর্ণনার সত্য-মিথ্যার দিকটিও তিনি মার্ক করে দিয়েছেন।[৬]

‘কুরআনুল কারীমের তাফসীর করার জন্য পনের প্রকারের ইলম প্রয়োজন। এই ইলম ও দলীল ছাড়া তাফসীর করা শুধু নিষিদ্ধই নয় বরং কুফরী’।[৭] এর মধ্যে বার প্রকার ইলম নাসিখ-মানসূখ এর সাথে সংশ্লিষ্ট। যে সকল মুফাস্‌সির সবদিক বিবেচনা করে এবং নাসিখ-মানসূখ, মুতাশাবিহাত আয়াত এবং মাহযুফ সমূহের উপর প্রবল প্রাজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতাসহ কলম চালিয়ে তাফসীর রচনা করেছেন তন্মধ্যে হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.)-এর মর্যাদা ও স্থান অনেক উপরে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- এর পাঠক অতৃপ্ত হয় না। সকল প্রশ্নের উত্তর যেন সামনে উপস্থিত। তিনি জ্ঞানগত (আকলিয়া), বর্ণনাগত (নকলিয়া) এবং শাখাগত (ফুরুঈয়্যাহ) ইলমের সব শাখাতেই পারদর্শী ছিলেন বিধায় মুফাস্‌সিরের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর সজাগ অনুভূতি ছিল।[৮]

এই তাফসীর প্রণয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমানদের চাওয়া হলো- পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয়াদি আমাদের ভাষাতেই যেন সহজভাবে আমরা পাই। এজন্য অনেক ভাষাতেই কুরআন মাজীদের অসংখ্য তাফসীর রচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উর্দূ ভাষীরাও কোন

---

[১]- আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৯৩।

[২]- মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, ড., (অনুবাদক), আশরাফুত তাফসীর তাফসীর নাঈ’মী (বাংলা), ভূমিকা, আলকুর’আন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা-বাংলাদেশ; ২০১৭খ্রি., পৃ.নং-৪১।

[৩]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, , পৃ.নং.- ৪০০।

[৪]- ঐ, পৃ.নং-২৪৪।

[৫]- এই তাফসীর লেখার সময় তিনি স্বপ্নে দেখেন, তিনি আজমীর শরীফ-এ খাজা মঈনুদ্দিন আজমিরী হাসান সানজিরী (র.আ.)-এর রওজা পাকের ভেতরে অবস্থান করছেন। এমতাবস্থায় খাজা গরীব নেওয়াজ কারো আগমন পথে চেয়ে রয়েছেন। হঠাৎ হুজুর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন। খাজা গরীব নেওয়াজ সরকারে মদীনাকে হাকীমুল উম্মাতের পক্ষ হতে ‘তাফসীর নাঈমী শরীফ’ উপহার দিলেন। আর হুজুর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা আপন হাত মুবারকে নিয়ে নিলেন। (সূত্র: আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১২৭।)

[৬]- ঐ, পৃ.নং-১০০।

[৭]- ইক্তেদার আহমদ খান নঈমী, মুফতী, তাফসীর নাঈমী, নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান; জানুয়ারি-২০০৫খ্রি., খন্ড-১৫, পৃ.নং-০৩।

[৮]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২০৩-২০৪।

অংশে পিছিয়ে নেই। কিন্তু ভারতবাসীরা মুসলমানদের এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব দলীয় স্বার্থ সিদ্ধি করেছে। নিজেদের বাতিল ধ্যান-ধারণা তাফসীরের নামে রং দিয়ে প্রকাশ করেছে। মির্যায়ীরা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুয়াতকে প্রাধান্য দিয়ে তাফসীর করেছে। চাকড়ালভী হাদীছ অস্বীকারকারীরা তাফসীরের আড়ালে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করেছে। কেউ বেলায়তী দৃষ্টিভঙ্গিতে কুরআনকে দেখেছে। আবার কেউ শয়তানী মন-মগজ নিয়ে কুরআন বুঝতে চেষ্টা করে প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোষ-ত্রুটি বের করতে লাগলো। শয়তানী মতবাদকে ঈমানী মতবাদ বানিয়ে সৃষ্টির সামনে পেশ করতে লাগলো। আজকাল প্রত্যেক ফের্কাবাজরা তাফসীরুল করআনকে নিজেদের রক্ষাকবচ বানিয়ে নিয়েছে। মসজিদে মসজিদে কুরআন দরসের নামে সরলপ্রাণ মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করা হচ্ছে। প্রত্যেক অনুপোযুক্ত উর্দূ ভাষী নিজেকে মুফাস্সিরে আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এজন্য দীর্ঘদিন ধরে আমার মনে ইচ্ছা ছিলো যে, এমন একটি তাফসীর লিখবো যেটি আরবী নির্ভযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহের সারনির্যাস হবে। এর মধ্যে বাতিল ফির্কার আপত্তিসমূহের প্রতিউত্তর হবে। কেননা, উর্দূ তাফসীরসমূহ সাধারণত বদ মাযহাবীদের রচিত। খুশীর খবর যে, আল্লাহপাক আমাকে পাঞ্জাবের গুজরাট এলাকায় প্রেরণ করেছেন।[1] এখানে প্রতিদিন তাফসীরুল কুরআন শুনানোর তাওফীক দিয়েছেন। আমি কল্পনাও করিনি যে আমার এই তাফসীরটি কিতাব আকারে প্রকাশিত হবে। ঘটনা হলো- আমার কিছু সাগরিদ (ছাত্র) প্রতিদিন তাফসীর লিখতে শুরু করে দিয়েছে। যখন কয়েক পারা শেষ হলো তখন সাধারণ মুসলমানেরা তা ছাপানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ঐ তাফসীর হুব-হু প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল। বরং সম্পাদনা করে অতিরঞ্জন ও দ্বিরুক্ত বিষয়াদি বাদ দিয়ে এবং নতুন বিষয় সংযোজন আবশ্যক ছিল। কেননা, পঠন ও লিখনের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে’।

আল্লাহপাকের উপর ভরসা করে এই সম্পাদনার কাজে লেগে গেলাম। প্রার্থনা করলাম- আল্লাহপাক আমার কলম ও কথাকে যেন ভুল হতে রক্ষা করেন, সত্যের উন্মেষ ঘটান এবং উত্তমভাবে এই কাজের পরিসমাপ্তি করেন। এই কর্মকে কবুল করে অধমের জন্য সদকায়ে জারিয়া এবং পরকালীন পাথেয় হিসেবে কবুল করেন।[2]

তিনি পবিত্র কুরআন মাজীদের ১১ পারার দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সূরা ইউনূসের ৬৮ নং আয়াত পর্যন্ত তাফসীর করেছেন। বাকি ২১ পারা পর্যন্ত তার প্রিয় সুপুত্র মুফতী মুহাম্মদ ইক্তেদার আহমদ খান নঈমী (র.আ.) করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ সবটুকু হাকীমুল উম্মাতের তাফসীর মনে করে থাকে। এটা ভুল। এছাড়া করাচী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মজীদ উল্লাহ কাদিরী ১৩ পারা পর্যন্ত হাকীমুল উম্মাতের তাফসীর বলে মত দেন।[3] যখন তিনি ১১ পারার সূরা তাওবার তাফসীর শেষ করলেন তখন অবগতি হলো যে, তাঁর হায়াত আর বেশী বাকী নেই। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, তিনি সূরা ইউনুস-এর أَلَا إِنَّ -أَوْلِيَاءَ اللهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ- (৬২নং) আয়াত-এর তাফসীর করবেন। এজন্য তিনি সরকারে

---

[1] - এ স্থলে একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য, তিনি এক হজ্বের সফরে দীর্ঘদিন মাদীনা মুনাওয়ারায় থাকার সুযোগ হয়েছিল। এই সময় তিনি মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন যে, এমন কোন ব্যবস্থা হয়ে যায় যাতে- তিনি স্থায়ীভাবে নাবীর শহরে থেকে যেতে পারেন। কিছু দিন পর মসজিদে নাবাবী শরীফের নিকট বসবাসকারী এক লোকের হুজুর আলাইহিস সালামের স্বপ্নে সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হলো। স্বপ্নে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, আহমদ ইয়ারকে দ্রুত গুজরাটে চলে যাওয়ার জন্য বল এবং সেখানে কুরআন তাফসীরের দায়িত্ব যেন পালন করে। স্বপ্নাদিষ্ট এখবর শুনার পর তিনি খুই আনন্দিত হলেন এবং বলতে লাগলেন- হুজুর আঁকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবার হতে গুজরাট যাওয়ার নির্দেশ হয়েছে। সুতরাং এখন গুজরাটই আমার জন্য মাদীনা। সুবহানাল্লাহ! (সূত্রঃ হায়াতে সালিক, পৃ.নং-১২৭-১২৮।)

[2] - আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, ইলমুল কুরআন, করাচী-পাকিস্তান; মাকতাবাতুল মদীনা, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ.নং- ০৪ ও ০৫। তাফসীর লেখার জন্য তিনি সাহিবে কুরআনের পক্ষ হতে মাদীনা শরীফে একটি পার্কার কলম (৫১) উপহার পান। যেটা দিয়ে তিনি শুধু তাফসীর লিখতেন। কোন ফাতওয়া, তাবীজ বা অন্যকোন কিছুই তিনি এই কলম দিয়ে লেখেননি। আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৮৭-১৪৮।

[3] - মজীদ উল্লাহ ক্বাদিরী, ড., প্রফেসর (করাচী ইউনিভার্সিটি), তাফসীর নাঈমী’র ভূমিকা (তাফসীর নাঈমী -বাংলা), আলকুর’আন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা-বাংলাদেশ; ২০১৭খ্রি.,খন্ড-০১, পৃ.নং-১৬।

মাদীনার দরবারে হায়াত বৃদ্ধির আরজ করলে তা মঞ্জুর করা হয় এবং ০৩ মাস হায়াত বৃদ্ধি করা হয়। সুবহানাল্লাহ! ঠিকই ঐ আয়াত অবধি তাফসীর করার পর তাঁর ইন্তেকাল হয়।[১]

তাফসীরটি বিভিন্ন প্রকাশনা হতে একাধিকবার এক এক খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। একসাথে ১১ খন্ড মাকতাবা ইসলামিয়্যাহ, গুজরাট হতে ১৯৮৩ সালের ২৮ জুন প্রকাশিত হয়। এগারো খন্ডের বিবরণ হলো-

ক্রম: নং	খন্ড	পারা	সুরার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা	তাফসীর সমাপ্তির তারিখ
০১	প্রথম খন্ড	প্রথম	আল-ফাতিহা ও আল-বাক্বারাহ	৭৫৮	২৭ জ্বিলক্বাদ-১৩৬৩ হিজরী/১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ
০২	দ্বিতীয় খন্ড	দ্বিতীয়	আল-বাক্বারাহ	৬৫০	২১ জুন- ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ
০৩	তৃতীয় খন্ড	তৃতীয়	আল-বাক্বারাহ ও আলে ইমরান	৭০৩	২৭ জমাদিউল আউয়াল-১৩৬৫ হিজরী/০৩ মে-১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ
০৪	চতুর্থ খন্ড	চতুর্থ	আলে ইমরান ও আন-নিসা	৬৪৬	২২ রবিউস সানি-১৩৮১ হিজরী/ ০২ অক্টোবর-১৯৬১খ্রিষ্টাব্দ
০৫	পঞ্চম খন্ড	পঞ্চম	আন-নিসা	৫৮৭	১৬ রবিউল আউয়াল-১৩৮৩ হিজরী/ ৭ আগস্ট-১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ
০৬	ষষ্ঠ খন্ড	ষষ্ঠ	আন-নিসা ও আল-মাইদা	৭২৬	২৯ মহররম-১৩৮৬ হিজরী/ ২১ মে-১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ
০৭	সপ্তম খন্ড	সপ্তম	আল-মাইদা ও আল-আন'আম	৮৪৪	১৭ জুমাদাল উলা-১৩৮৭ হিজরী/ ২৪ আগষ্ট-১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ
০৮	অষ্টম খন্ড	অষ্টম	আল-আন'আম ও আল-'আরাফ	৭৪৩	১৯ শাবান-১৩৮৮ হিজরী/ ১১ নভেম্বর-১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ
০৯	নবম খন্ড	নবম	আল-'আরাফ ও আল-আনফাল	৬৮৮	০৮ জমুদাল উলা-১৩৯০ হিজরী/ ১৩ জুলাই-১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ
১০	দশম খন্ড	দশম	আল-আনফাল ও আত্-তাওবা	৫৬৮	২০ মহরম-১৩৯১ হিজরী/ ১৮ মার্চ-১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ
১১	একাদশ খন্ড	একাদশ	আত্-তাওবা, আল-ইউনুস এবং আল-হুদ	৫৬৮	১১ ডিসেম্বর-১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

তাফসীরটির বাংলা অনুবাদ শুরু হয়েছে। এই মহৎ কাজে হাত দিয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশের বিশিষ্ট কুরআন গবেষক, লেখক, অনুবাদক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-ঢাকা'র ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও কলা অনুষদের সাবেক ডিন, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ।[২] ইতোমধ্যে প্রথম পারার প্রথম ভাগ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান-এর নীরিক্ষণে আলকুর'আন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা-বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত হয়েছে।

---

[১]- আসীফ ইকবাল মাদানী, মুহাম্মদ, 'তাফসীরে নাঈমী কে তা'আল্লুক ছে এক উলজান কা জাওয়াব' (উর্দূ প্রবন্ধ)। এই বিষয়ে অত্র প্রবন্ধে লেখক দালীলিক আলোচানার মাধ্যমে সকল সন্দেহ দূরীভূত করে দিয়েছেন। (আল-হামদুলিল্লাহ!)

[২]-তিনি চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন। 'বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনার উপর তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

নূরুল ইরফান ফী হাশিয়াতিল কুরআন

(نور العرفان فی حاشية القران)

‘নূরুল ইরফান’ উর্দূ ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ, তথ্য ও ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ তাফসীর।[১] এটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর সমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম তাফসীর। আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরেলভী (র.আ.)-এর অনূদিত কুরআন মাজীদের তরজুমা ‘কানজুল ঈমান ফী তারজুমাতিল কুরআন’[২]-এর তথ্যবহুল, সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থ; যাতে আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, তদ্‌সঙ্গে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম গুঢ় বিষয়, শান-এ নুযূল এবং সুনির্দিষ্ট আক্বীদার বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] এটি তাঁর পীর ও শিক্ষক সদরুল আফাযীল আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.আ.)-এর তাফসীর ‘খাযাইনুল ইরফান’-এর অতিভাষ্যও বলা যায়। তিনি এই তাফসীরটি ১৩৩৭ হিজরীর দিকে লিখেছিলেন।[৪] ১৯৫৭ সালের দিকে এটি প্রকাশিত হয়। এই তাফসীর দেখে তৎকালীন বিদগ্ধ ওলামা সমাজ খুবই খুশী হন। এমন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল তাফসীর রচনার পুরস্কার স্বরূপ পাক-ভারতের সুযোগ্য-বুযর্গ ওলামা সমাজ তাঁকে ১৯৫৭ সালে ‘হাকীমুল উম্মাত’ উপাধীতে ভূষিত করেন।[৫] এই তাফসীরটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল-

১. সংক্ষিপ্তাকারে আয়াতের অর্থ এবং উদ্দেশ্য সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় লিখেছেন।
২. আয়াতসমূহ হতে জ্ঞানগত-যুক্তিগত উভয়বিধভাবে শরয়ী‘ দলীল বের করা হয়েছে।
৩. জ্ঞানগত-যুক্তিগত আপত্তিসমূহের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।
৪. প্রজ্ঞাপূর্ণ উদাহরণ-উপমা বর্ণনা করে তাফসীরটির বোধগম্যতা সহজ করা হয়েছে।
৫. দিলকশ (মনোমুগদ্ধকর) সুক্ষ বিষয় এবং উপকারী দিক বর্ণিত হয়েছে।
৬. আহলে সুন্নাত-এর আক্বীদা-দৃষ্টিভঙ্গি দলীল সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।
৭. শান-এ নুযূলের সাথে শান-এ রাসূল (সা.) বর্ণনা করা হয়েছে।
৮. আহলে বাইত এবং সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-এর মান-মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে।
৯. আয়াত এবং হাদীসের পারস্পরিক বিরোধ নিঃস্পত্তি করা হয়েছে।
১০. আয়াতের সাথে আয়াতের বিরোধ নিরোধ করা হয়েছে।
১১. সূফীগণের দৃষ্টিভঙ্গি-শিক্ষাকে আশ্রয় করে তাফসীর পেশ করা হয়েছে।[৬]
১২. নবীগণ আলাইহিমুস সালাম-এর বংশনামা (শাজরা শরীফ) বর্ণনা করা হয়েছে।
১৩. তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কার সাথে কার কী সম্পর্ক আছে তা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।
১৪. তাঁদের পরস্পরের মধ্যে প্রেরণের দূরত্ব কত বছরের তা বর্ণনা করেছেন।
১৫. মাসআলা বর্ণনার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।
১৬. আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের প্রাসঙ্গিক ব্যবহার উত্তম পদ্ধতিতে সংযোজন করা হয়েছে।

---

[১]- হক মুহাম্মদ, জি.এ, প্রফেসর, নুরুল ইরফান আ'লা কানযুল ঈমান (ইংরেজি ভাষায় অনূদিত), খন্ড-০১, পৃ.নং-৩৪ (Index).

[২]- ইমাম আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী (র.আ.)-এর ‘কানযুল ঈমান ফী তারজুমাতিল কুরআন’কে ভিত্তি করে যে সকল মুফাস্‌সির তাফসীর রচনা করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন- আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (ওফাত-১৯৪৮খ্রি.), হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী (ওফাত-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.) আল্লামা হাশমত আলী পীলীভেতী (ওফাত-১৩৮০হি.), মাওলানা মুহাম্মদ খলীল আহমদ খান বারকাতী (ওফাত-১৯৮৪খ্রি.), মাওলানা আবুল হাসানাত সৈয়্যদ মুহাম্মদ আহমদ ক্বাদিরী (ওফাত-১৯৮০খ্রি.) ও আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আল-আযহারী (ওফাত-১৯৮৯খ্রি.)। (সূত্র: মজীদ উল্লাহ ক্বাদিরী, ড., প্রফেসর, প্রাগুক্ত, খন্ড-০১, পৃ.নং-১৫-১৬।)

[৩]- https://ur.wikipedia.org/wiki/ نور_العرفان_فی_حاشیہ_قرآن

[৪]- মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, ড., তাফসিরে না'ঈমী (বাংলা) অভিমত, ড. মজীদ উল্লাহ ক্বাদিরী, প্রফেসর, করাচী ইউনিভার্সিটি, খন্ড-০১, পৃ.নং-১৬।

[৫]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৮৬।

[৬]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৫৫১।

১৭. বিভিন্ন রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।
১৮. আ'লা হযরতের তারজুমার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা হয়েছে। এবং
১৯. ইসমতে আম্বীয়া (নবীগণ আ. নিঃষ্পাপ হওয়া বিষয়)-এর সংরক্ষণ করা হয়েছে।[১]

উর্দূ ভাষায় রচিত এই তাফসীরটি ৯০৮ পৃষ্ঠার বিশাল এক গ্রন্থ। নাঈমী কুতুবখানা, লাহোর-পাকিস্তান হতে প্রকাশিত হয়। বৈশ্বিক চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে এই তাফসীরটি দক্ষিণ আফ্রিকা হতে মুফতীয়ে আজম আফ্রীকা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আকবর হাজারভী ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেন। এটির দুই খন্ডে বাংলা তরজুমা করেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম, আঞ্জুমান রিসার্চ সেন্টারের মাহাপরিচালক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান সাহেব।[২]

---

[১] -ঐ, পৃ.নং-৫৫৯।

[২] - মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (জন্মঃ ৩ মার্চ ১৯৬০) বাংলাদেশের একজন ইসলামী রাজনীতিবিদ, লেখক এবং গবেষক। যিনি এম. এ. মান্নান বা আল্লামা এম. এ. মান্নান নামে পরিচিত। তিনি বর্তমানে ‘বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট’-এর চেয়ারম্যান এবং আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। আবদুল মান্নান চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের ইয়াছিন নগর গ্রামে ১৯৬০ সালের ৩ মার্চ বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গাজি খলিফা। (সূত্রঃ https://bn.wikipedia.org/wiki/মুহাম্মদ_আব্দুল_মান্নান)

ফায়দ্বান-এ সূরা নূর

(فیضان سورۃ نور)

পবিত্র করআনুল কারীমের ১১৪টি সূরা মুবারাকার মধ্যে ২৪ নং ‘সূরা আন-নূর’ বিশেষ বৈশিষ্ট্যে মর্যাদা মন্ডিত। আল্লাহ পাক এই সূরার মাধ্যমে নাবী পরিবারের সম্মান বৃদ্ধি করে পবিত্রতার সংবাদ দিয়ে নাবীজির অন্তঃকরণে প্রশান্তি প্রদান করেছেন এবং নাবী পরিবারের সম্মানকে আলোক ধরায় উদ্ভাসিত করে নামের প্রতি সুবিচার করেছেন। এজন্য প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, “তোমরা আপন স্ত্রীদের ঘরের উপরের কক্ষে পর্দাহীন বসাইও না, তাদের লেখা শিখাইও না[১] বরং তাদের চরখায় সূতা কাটা (হস্তশিল্প) শিখাও এবং সূরা নূর শিক্ষা দাও”।[২]

এই হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) বলেন, ‘কেননা, এই সূরাতে পর্দা, হায়া-শরম এবং পূত-পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে বিধান বর্ণিত হয়েছে বিধায় একে বিশেষ করে নারীদের শিক্ষাদানের জন্য নাবীজি নির্দেশ দিয়েছেন’।[৩]

এছাড়া মু‘মিনদের খলিফা হযরত ওমার ইবনু খাত্তাব (রা.) কুফাবাসীদের উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখে মুসলিম নারীদের ‘সূরা নূর’ শিখানোর নিদের্শ দেন।[৪] এটাও বলা যায় যে, নারীগণ মা জাতি। আর মায়ের কোল শিশুর প্রথম পাঠশালা। যে মা এই সূরার বিধি-বিধান আত্মস্থ করতে পারবেন তিনি আপন পরিবার ও সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদানে সক্ষম হবেন।

হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) উক্ত হাদীছ পাকের গুরুত্ব অনুধাবন করে অত্র সূরার আলাদা তাফসীর রচনা করেছেন। তিনি নিজে তাঁর কন্যাদের ইলম শিক্ষা দিতেন। এমনকি তিনি নিজ পুত্রবধু-কন্যাদের চার বছর ধরে মিশকাত শরীফ ও বুখারী শরীফ পড়িয়েছেন। তাঁর স্ত্রী-কন্যারা নিজ ঘরে বহিরাগত বাচ্চা-মহিলাদের শিক্ষা দিতেন।[৫] পর্দাযুক্ত নারী শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। আলাদা করে এই সূরার তাফসীর রচনা করে তিনি মুসলিম নারীদের উপর বড়ই অনুগ্রহ করেছেন।

বইটির প্রথম প্রকাশ অজানা। অনেক খুঁজেও তার সন্ধান করতে পারিনি। তবে বইটি নবআঙ্গিকে টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করে ১২৮ পৃষ্টা করে মাজলিসু মাদীনাতিল ইলমিয়্যাহ (দাওয়াতে ইসলামী- পাঠ্যবুক বিভাগ)-এর তত্ত্বাবধানে মাকতাবাতুল মাদীনা, করাচী-পাকিস্তান হতে শা’বান-১৪৩৪ হি./জুন-২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়। এটি এখনো বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়নি।

---

[১] - মেয়েদের লেখা শেখানোর ব্যাপারে এই নিষেধাজ্ঞা ‘নাহী তানযীহি’ অর্থাৎ- হালকা অপছন্দনীয় কাজ। এই হাদীসের নীরিখে আ‘লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (র.আ.) ফাতওয়া রেজভীয়্যাহতে বলেন, ‘স্ত্রী-কন্যাদের লেখা শেখানো নিষিদ্ধ’। তিনিও এখানে নিষেধাজ্ঞা বলতে নাহী তানযীহি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মৌলিকভাবে লেখা শেখা কোন দূষনীয় বিষয় নয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে বাহ্যিক কারণে (ফিৎনার আশংকা থাকলে) অপছন্দ করা হয়েছে। এছাড়া হাদীসের বর্ণনাকারী উম্মুল মু‘মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) নিজেই লেখা শিখেছেন। এছাড়া মু‘মিন মাতা হযরত হাফসা বিনতে ওমার (রা.), হযরত শিফা বিনতে আব্দিল্লাহ (রা.) এবং হযরত আইশা বিনতে তালহা (রা.) লিখতে জানতেন। তাঁরা এর দ্বারা ইসলামের প্রভূত কল্যাণ করেছেন। ফিৎনার আশংকা না হলে সকল আলিমের মতে জায়িয। কেননা, ইলম শিখা নারী-পুরুষ উভয়ের উপর ফরয। লেখা শেখাও জ্ঞানার্জনের অন্তর্ভূক্ত। লেখা শিখতে গিয়ে যদি ফিৎনা হয়, তবে সকলের মতে তা নিষিদ্ধ হবে। (সূত্র: আহমদ রেযা খান বেরেলভী, আ’লা হযরত, ফাতওয়া রেজভীয়্যাহ, মাকতাবাতুল মাদীনা, করাচী-পাকিস্তান; ২য় প্রকাশ, ১৪৩৪হি./২০১৩খ্রি, খন্ড-২৩, পৃ.নং-৬৯১; জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আমজাদী, ফহীহে মিল্লাত, ফাতওয়া আমজাদীয়া, শাব্বীর ব্রাদার্স, লাহোর, পকিস্তান; ২০০৫খ্রি., খন্ড-০৪, পৃ.নং-২৪৯; ওয়াক্বারুদ্দীন, মুফতী, ওয়াক্বারুল ফাতওয়া, বজমে ওয়াক্বারুদ্দীন, করাচী-পকিস্তান; সফর-১৪২১ হি./মে-২০০০ সাল, খন্ড-০৩, পৃ.নং-৪৩৫।

[২] - মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল্লাহ, হাকীম আন-নিশাপূরী (৩৪১হি./৯৩৩খ্রি.-৪০৫হি./১০১২খ্রি.), আল-মুসতাদরাক আলাস-সাহীহাইন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-লেবানন; ১ম প্রকাশ, ১৪১১হি./১৯৯০খ্রি., খন্ড-০৩, পৃ.নং-১৫৮, হাদীছ নং-৩৫৪৬। হাদীছ শরীফটির বর্ণনাকারী মু’মিনগণের মা আয়শা সিদ্দীকা (রা.)। তাঁর শানে এই সূরার অধিকাংশ আয়াত অকতীর্ণ হয়।

[৩] - আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, নূরুল ইরফান ফী হাশিয়াতিল কুরআন (উর্দূ), তারিখ বিহীন, সূরা: আন-নূর, ২৪:০১, পৃ.নং-৫৫৮।

[৪] - ইসমাঈল হাক্বী, আলুসী (১০৬৩হি./১৬৫৩খ্রি.-১১২৭হি./১৭২৫খ্রি.): রুহুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল ফিকর, বৈরুত-লেবানন; ১৪ নভেম্বর-২০১০খ্রি., খন্ড-১২, পৃ.নং-১৫৮।

[৫] - আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩৫।

ইলমুল কুরআন লি-তারজুমাতিল ফুরক্বান
(علم القران لترجمة الفرقان)

কুরআন মাজীদ ইসলাম ধর্মের এবং মুহাম্মদী শরী‘আতের মৌলিক ভিত্তি ও দলীল। এর মধ্যে আল্লাহপাকের সত্তা-গুণাবলীর প্রমাণ রয়েছে। পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম এবং আমাদের প্রিয় রাসূল অতুল-এর নবুয়াত-রিসালাত ও সম্মানের কথা বিবৃত হয়েছে। হালাল-হারাম, ইবাদত-লেনদেন, শিষ্টাচার-উত্তম চরিত্রসহ নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। পরকাল-পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহান্নাম বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এছাড়া মানুষের হিদায়েতের জন্য যা যা প্রয়োজন ঐ সব কিছুই কুরআন মাজীদে আল্লাহপাক বর্ণনা করে দিয়েছেন।[১] এই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, "(হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!) আমি আপনার উপর কুরআনকে সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা সহকারে অবতীর্ণ করেছি"।[২] ইলমুল কুরআন লি-তারজুমাতিল ফুরকান (علم القران لترجمة الفرقان) বইটি হাকীমুল উম্মাত রচিত ঐ কুরআনের বিশেষ শব্দাবলীর গভীর বিশ্লেষণধর্মী শাব্দিক-পারিভাষিক পরিচিতি বিষয়ের সমাধান মূলক গ্রন্থ। মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) এই গ্রন্থটি ২২ রামদ্বান শরীফ, রোজঃ রবিবার, ১৩৭১ হিজরীতে রচনা শুরু করে ০৫ যিলক্বাদ, রোজঃ রবিবার, ১৩৭১ হিজরীতে মোট ০১ মাস ১২ দিনে শেষ করেন।[৩] তিন অধ্যায়ে বিন্যস্ত ১৯২ পৃষ্ঠার বইটিতে লেখক কর্তৃক আলোচ্য বিষয়াদি হল-

প্রথম অধ্যায়ঃ কুরআনুল কারীমের পরিভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট। এখানে গ্রন্থকার ঈমান, ইসলাম, তাক্বওয়া, কুফর, শির্ক, বিদ‘আত, ইলাহ, ওয়ালী, দো‘আ, ইবাদত, মিন দূ-নিল্লাহ, নযর-নেয়ায, খাতামুন নবীয়্যিনসহ ১৩টি শব্দ ও শব্দসমষ্টির পরিচিতি, প্রকরণ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিধান আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অথ্যায়ঃ কুরআন মাজীদের ক্বাইদা তথা রুলমূহের বর্ণণা করা হয়েছে। এখানে মোট ৩০টি ক্বাইদার বর্ণনা করেছেন, যা কুরআন তাফসীর করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কুরআন কারীমে বর্ণিত মাসআলা সমূহের বর্ণনা এসছে এখানে। বর্তমান সময়ে মতবিরোধের বিষয়ে পরিণত হওয়া মাসআলা সমূহের আলোচনা এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। এতে ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত’-এর দৃষ্টিতে ওয়ালীগণের মর্যাদা, সাধারণ মানুষের সাথে তাঁদের সম্পর্ক, মৃত্যুর পর জীবিতদের সাথে সম্পর্ক, বিশেষ দিবস পালনের যথার্থতা, বুযর্গদের অবস্থান স্থলের মর্যাদা, সত্যিকারের নাজাতী দলের পরিচয়, কুরআনের আয়াত পড়ে ফুঁক দেয়া, সকল সাহাবা হাক্ব এবং ঈসা মাসীহ (আ.) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তিন অধ্যায় মিলে আমরা যা পাই তা হলো-

১. পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতের প্রকরণ,
২. কুরআন তাফসীরের পদ্ধতি ও বিধান,
৩. কুরআনিক পরিভাষা সমূহ ও এগুলোর আলাদা আলাদা বর্ণনা,
৪. কুরআনিক নীতি (ক্বাইদা) সমূহ (কুরআনিক শব্দসমূহের অর্থ জানার পদ্ধতি সমূহ),
৫. কুরআনিক মাসআলা (এগারটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।[৪]

---

[১]- আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, ইলমুল কুরআন (তাখরীজ কৃত) ভূমিকা, মাজলিস আল-মাদীনাতিল ইলমিয়্যাহ, (শুবা তাখরীজ), দাওয়াতে ইসলামী, করাচী-পাকিস্তান; পৃ.নং-০২।

[২]- আল-কুরআনুল কারীম, সূরাঃ আন-নাহল, ১৬:৮৯।

[৩]- ইলমুল কুরআন (তাখরীজ কৃত) ভূমিকা, পৃ.নং- ০২।

[৪]- ঐ, পৃ. নং- ১০-১৪।

বইটির শুরুতে লেখকের সুযোগ্য পুত্র আল্লামা ইক্তেদার আহমদ খান নঈমী ’র সংক্ষিপ্ত ভূমিকা, এর পর কুরআনিক বিজ্ঞানের উপর বইটি প্রণয়নের কারণ প্রসঙ্গে লেখকের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবৃত হয়েছে। তিনি বলেন, “মুফাস্‌সিরে কুরআন হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব মুসলমানদের কুরআনের তাফসীর পড়ার জন্য এবং ফিৎনা হতে তাদের বাঁচানোর জন্য এই বইটি রচনা করেছেন। যাতে করে এই বই পাঠ করে মুসলমানগণ কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে”।[১] এই গ্রন্থ সম্পর্কে আবুল হাক্বাইক শাইখুল কুরআন আল্লামা আব্দুল গফুর হাজারভী (১৩২৬হি./১৯০৯খ্রি.-১৩৯০হি./১৯৭০খ্রি.)[২] বলেন, “এটি হাকীমুল উম্মাতের রচিত শুধুমাত্র সাধারণ কোন গ্রন্থ নয় বরং তাঁর কারামত”।[৩] শাইখ বিলাল আহমদ সিদ্দিকী বলেন, এই বই পড়েই অনুধাবন হলো যে, কুরআনুল কারীম বুঝার জন্য কতটুকু গভীর চিন্তা-গবেষণা, প্রচেষ্টা-শক্তিব্যয়-এর দরকার হয়। হাকীমুল উম্মাত কুরআন শরীফের কতগুলি শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও সেগুলির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের যে লেখচিত্র যেই ঢংয়ে করেছেন তা ইতোপূর্বে কেউ করেনি। এর দ্বারা তাঁর গভীর জ্ঞানের বিষয়েও অবহিত হওয়া যায়।[৪]

প্রকাশকাল উল্লেখ ব্যতিত এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান হতে প্রকাশিত হয় এবং শাওয়ালুল মুকার্‌রাম, ১৪২৮ হিজরী মুতাবিক নভেম্বর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে মাকতাবাতুল মাদীনা, বাবুল মাদীনা, করাচী-পাকিস্তান হতে বইটি ২৪৪ পৃষ্ঠা সহকারে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফর রহমান (মালিক- মুহাম্মদী কতুবুখানা, আন্দরকিল্লা-চট্টগ্রাম), ০১ অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে নিজ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হতে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।

---

[১]- ঐ, পৃ.নং- ১৫।

[২]- তিনি ‘আবুল হাক্বাইক’ উপাধীতে পরিচিত ছিলেন। তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার এবোটাবাদ (বর্তমান পাকিস্তানের খায়বারপাখতুনখাঁ প্রদেশের হাজারা জিলার হরীপুর) জেলার কোড নজীবুল্লাহ এলাকার চাম্বাহপীন্ড নামক জায়গায় ০৯ জ্বিলহজ্ব ১৩২৬ হিজরী জুমাবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে পীর-এ তরীক্বত, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিছ, কবি, তার্কিক, সুবক্তা, দার্শনিক, শিক্ষক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ‘খতমে নবুয়াত আন্দোলন’ ও ‘সমাজবাদ’কে কফুরী ফতোয়াদানকারী ওলামাদের অগ্রগণ্য ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রনায়ক এই মহান ব্যক্তি ০৭ শাবান ১৩৯০ হিজরী মুতাবিক ০৯ অক্টোবর-১৯৭০ সালে জুমাবার ইন্তেকাল করেন। (সুত্রঃ https://ur.wikipedia.org/wiki/عبد_الغفور_ہزاروی)

[৩]- নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২২।

[৪]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩৩২ ও ৩৩৩।

দারসুল কুরআন

(درس القران)

এই বইয়ে হাকীমুল উম্মাত কর্তৃক গুজরাটের ‘গাউছিয়া জা‘মে মসজিদ’-এ প্রতিদিন বাদ ফজর প্রদত্ত ১১টি আয়াতে কারীমার তাফসীর একত্রিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। এই তাফসীর মজলিসের পরিবেশ সম্পর্কে হাকীমুল উম্মাতের সাহিবযাদা মুফতী মুহাম্মদ ইক্তেদার আহমদ নঈমী বলেন, ‘হুজুরের বড় দান হলো সকালের দরসুল কুরআন। এটি প্রথমবার ১৯ বছরে শেষ হয়। দ্বিতীয়বার শুরু হয়েছে তিন বছর হলো, যা দেড় পারা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই দরস সমূহের মজা সেই বলতে পারবে যিনি এতে অংশ নিয়েছেন। কোন কোন আয়াতের তাফসীর সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে! এই দরস সমূহ একত্রিত করে প্রকাশ করার জন্য পীর সৈয়্যদ মা‘সুম শাহ নাওশাহী ক্বাদিরী অনুরোধ করলে হাকীমুল উম্মাতের ছাত্র হাকীম সর্দার আলী সাহেব হুজুরের দরসগুলো হুবহু লিখতে শুরু করে দেন। এগুলি দাতা গঞ্জবখশ লাহোরী (র.আ.)-এর দরবারের পত্রিকা ‘আসতানা-এ ফায়জ-এ আলম’-এ ধারাবাহিক প্রকাশ হতে থাকে’।[১] তন্মধ্য হতে ১১টির তাফসীর একত্রিত করে “দারসুল কুরআন” শিরোনামে ছাপানো হয়েছে। এগারো আয়াতে কারীমা হলো-

১. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৫১: كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ- “যেভাবে আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তোমাদের পবিত্র করবেন, তোমাদের কুরআন এবং প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন। আরো শিক্ষা দেবেন যা তোমরা জানতে না”।

২. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং- ১৫২: فَاذْكُرُوْنِىْ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوْ لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ- অর্থাৎ-“সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার কৃতজ্ঞ হও, কৃতঘ্ন হয়ো না”।

৩. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৫৩: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ- অর্থাৎ- “ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহপাক ধৈর্য্যশীলদের সাথেই আছেন”।

৪. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৫৪: وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ- অর্থাৎ- “আর যে আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা তাঁদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না”।

৫. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৭৪: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- অর্থাৎ- “নিশ্চয়ই যারা আল্লাহপাক কিতাবে যা অবতীর্ণ করেছে তা গোপন করে এবং সামান্য মূল্যে বিক্রি করে; ঐ সকল লোক তার বিনিময় যা খায় তা অগ্নি ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহপাক কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না। তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে”।

৬. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৬৪: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ- অর্থাৎ- “নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি, রাত ও দিনে আবর্তন, জাহাজ- যা সমুদ্রে লোকজনের উপকার নিমিত্তে চলে, আর আল্লাহপাক আসমান হতে যে পানি বর্ষন করে মৃত

---

[১]- আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, দারসুল কুরআন (রাসাইল-এ নাঈমিয়্যাহ), নাঈমী কুতুবখানা, উর্দুবাজার, লাহোর-পাকিস্তান, তারিখ বিহীন; পৃ.নং-৩৯৩ ও ৩৯৪।

জমিনকে জীবিত করেন, জমিনে সব রকমের প্রাণি ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর বাতাসের গতি পরিবর্তন করে, আসমান-জমিনের মাঝে ঘূর্ণায়মান মেঘরাশির মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানবানদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে”।

৭. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৬৫: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ- অর্থাৎ- “আর কিছু লোক আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকিছুকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহর অনুরূপ ভালোবাসে। অথচ, ঈমানদারের নিকট আল্লাহর সমান কারো জন্য ভালোবাসা নেই। আর যারা অন্যায় করেছে তারা যদি শাস্তিকে তাদের সামনে আসতে দেখতো (কতই না ভালো হতো)! নিশ্চয়ই সকল ক্ষমতা আল্লাহর, আর এটা এজন্য যে, আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর”।

৮. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৭৩: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ- অর্থাৎ- “নিশ্চয়ই (আল্লাহপাক) মৃত প্রাণি, রক্ত, শুকরের গোস্ত এবং যে সব হালাল প্রাণি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নামে জবেহ করা হয় তা সবই তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু কেউ যদি বাধ্য হয়ে (জীবন বাঁচানোর জন্য) সীমালঙ্ঘনকারী বা অন্যায়কারী না হয়ে (খায়) তার পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু”।

৯. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৮৬: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ - অর্থাৎ- “আর হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যখন আমার বান্দা আপনার নিকট আমার বিষয়ে জানতে চাইবে (তাদেরকে বলুন) আমি অবশ্যই নিকটেই আছি। প্রার্থনাকারী যখনই আবেদন করে তখনই সাড়া দিই। সুতরাং তাদের উচিত আমার আদেশ মান্য করা এবং আমার উপর আস্থা স্থাপন করা; যাতে তারা সুপথ পায়”।

১০. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-৩১: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ- অর্থাৎ- “হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে তবে, আমার অনুগত হয়ে যাও! আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু”।

১১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১৯০: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ- অর্থাৎ- “ওহে যারা ঈমান এনেছ! আমি যা তোমাদের রিযিক হিসেবে পবিত্র বস্তুসমূহ দিয়েছি তা হতে খাও! আর আল্লাহপাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা শুধু তারই ইবাদত করে থাক”।

আয়াত সমূহের নির্বাচন এবং এগুলোর উপর মনোজ্ঞ আলোচনা হাকীমুল উম্মাত-এর প্রবল প্রজ্ঞা এবং ঐশী জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। বইটির বিশেষত্ব বর্ণনা করে শাইখ বিলাল আহমদ সিদ্দিকী বলেন, ‘হাকীমুল উম্মাতের এই রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট হল- ‘শহীদগণ জীবিত প্রমাণ করতে গিয়ে ১২টি দলীল উপস্থাপন করে সন্দেহে নিপতিত অন্তরকে প্রশান্তি দিয়েছেন’।[১]

২১৬ পৃষ্ঠার বইটি রাসাইল-এ নাঈমীয়্যাহ গ্রন্থের মধ্যে সংযোজিত হয়ে নাঈমী কুতুবখানা, লাহোর-পাকিস্তান হতে তারিখ বিহীন প্রকাশিত হয় এবং অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়ে চট্টগ্রাম-আন্দরকিল্লা নিশান প্রকাশনী হতে ০১ অক্টোবর ১৯৯৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

---

[১]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩১২।

মিরআতুল মানাজীহ শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ

(مرأة المناجيح شرح مشكواة المصابيح)

এটি ইমাম খতীব তিবরিযী রচিত ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’-এর উর্দূ তরজুমা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ছাত্র, আলিম সমাজ এবং সাধারণ সমাজের জন্য এটি সহজবোধ্য উপকারী ব্যাখ্যা গ্রন্থ। আট খন্ডের এই ব্যাখা গ্রন্থটি মার্চ-১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ডিসেম্ভর ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১০ বছর সময় ধরে রচিত হয়। বইটি লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে- ‘মিশকাত শরীফের মতো সর্বজন গ্রহণীয় কিতাবে সহজ-সরল ব্যাখ্যা রচনা হওয়া সময়ের দাবী ছিল। যাতে নতুন নতুন বাতিল মতবাদের খন্ডন হয়’। হাকীমুল উম্মাত বলেন, ‘বর্তমান সময়ে মুসলমানগণের কুরআন-হাদীসের তরজুমা পড়ার খুবই শখ। প্রত্যেকের চাওয়া হলো- নিজের প্রভুর এবং প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীকে বুঝবে। এরূপ আগ্রহ খুবই সম্মানযোগ্য। সাধারণের এই আগ্রহের কেউ কেউ গলত ফায়দা লুটেছে। অনুবাদের নামে ভুল আক্বীদা-দৃষ্টিভঙ্গি এবং মন্দ চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে দিয়েছে। মুসলমান পরষ্পর দলবাজি করে বিবাদে জড়াচ্ছে। এমন স্পর্ধা হয়েছে যে, একদল হাদীছ শরীফকে অস্বীকার করে বসেছে। তাই দরসে নেজামীর প্রথম কিতাব আরব-আজমে সর্বজন গ্রহণযোগ্য ও পঠিত হাদীছ শরীফের কিতাব ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ এর শরাহ লিখবো যাতে এসব বিষয়ের প্রতিরোধ ও প্রতিউত্তর হয়। বিশেষত, আলোমুহরা শরীফের সাজ্জাদানশীন পীর জনাব ফয়জুল হাসান সাহেব এবং আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু জনাব হাকীম সর্দার আলী সাহেব-এর অনুরোধে এবং আমার প্রিয় সন্তান মুফতী মুখতার নঈমী’র শ্রুতি লেখনের দায়িত্ব নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর উপর ভরসা করে শরাহ শুরু করে দিলাম’।[১] অনন্যসব গুণে গুণান্বিত অত্র গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো-

১. এই শরাহ রচনার মূল কারণ হলো- হাদীছ অস্বীকারকারীদের অপনোদন করা এবং শরীআতের দলীল হিসেবে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা প্রামান করা। এজন্য তাদের মৌলিক সন্দেহের অপনোদন সহকারে জবরদস্ত প্রতিউত্তর দেয়া হয়েছে।

২. গ্রন্থকার এতে ‘মিরকাতুল মাফাতীহ শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ, কৃত: মুল্লা আলী আল-ক্বারী আল-হানাফী, ‘লুম‘আতুত তানক্বীহ ফী শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ’ ও আশি‘আতুল লুম‘আত’ কৃত: শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন।[২]

৩. এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে তিনি হাদীছ বর্ণনাকারীদের নাম গবেষণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে অপরিচিতকে সুপরিচিত করে দিয়েছেন।

৪. এই গ্রন্থের মধ্যে হাকীমুল উম্মাত রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছ মুবারকের সাথে সম্মানিত সাহাবী ও তাবিঈগণের ‘আফ‘আল’ বা আমলীয় কর্মসমূহেরও বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।[৩]

৫. এই গ্রন্থে হাদীছের প্রকরণ বর্ণনার সাথে সাথে গ্রন্থকার ‘গাইরে সাহীহ’-এর প্রকরণসমূহ বিশদভাবে র্বণনা করে এর অস্বীকারকারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন।[৪]

---

[১]- আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, মুফতী, মিরআতুল মানাজীহ শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ, নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান; তারিখ বিহীন, খন্ড-০১, পৃ.নং-১৯।

[২]- সূত্রঃ https://ur.wikipedia.org/wiki/ مرآت_المناجیح

[৩]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২৪৯।

[৪]- আহলে হাদীছরা সাহীহ ছাড়া অন্যকোন হাদীছ মানতে রাজি নয়। অথচ সোনালী যুগ হতে শুরু করে প্রত্যেক যুগের মান্যবর ইমাম-মুজতাহিদগণ ঈমান ও ফরযিয়্যাত ছাড়া বাকী আমলসমূহের ক্ষেত্রে গাইরে সাহীহ হাদীছ গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত দান সহকারে আমল করে আসছেন। কখনো কখনো মুহাদ্দিসগণ কোন এক হাদীসের সনদের ব্যাপারে لایصح লিখে থাকেন যার অর্থ: এই হাদীছ সাহীহ নয়। এই বাক্য দেখে কিছু অনভিজ্ঞ লোক ঐ হাদীছকে মউদ্বু’ (বানাওয়াট) বা বাতিল (বাদ) বলে মনে করে থাকে। অথচ মুহাদ্দিগণের পরিভাষায় সাহীহ কখনোই মউদ্বু’ (বানাওয়াট) বা বাতিল (বাদ) এর বিপরীত নয়। বরং সাহীহ-এর বিপরীত সাহীহ লি-গাইরিহি, হাসান লি-যাতিহি, হাসান লি-

৬. বিভিন্ন শরয়ী‘ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রদানসহ এর প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন, যেমন صَلَوَاةٌ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এটি صَلىٌّ হতে নির্গত। এর অর্থ: গোস্ত ভূনা করা। আগুনে পাকানো। এই অর্থে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ । আগুনে পুড়িয়ে কাঠকে সোজা করাকেও আরবীতে تَصْلِيَّةٌ বলে। কেননা নামায নামাযির নফসকে কঠোর রিয়াজতের আগুনে প্রজ্জ্বলিত করে থাকে বিধায় একে ‘সালাত’ বলা হয়। এছাড়া ‘সালাত’-এর অর্থ দো‘আ, রহমত, রহমত বর্ষিত হওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা, নিতম্ব ঘুরানো। যেহেতু এইসব বিষয় নামাযে হয়ে থাকে বিধায় একে ‘সালাত’ বলে।[১]

৭. ফিক্বহী মাসআলা বর্ণনার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের আলোকে সাবলীল ভাষায় তা উল্লেখ করেছেন।

৮. চার মাযহাবের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. বিভিন্ন কিছুর নামের নামকরণের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

১০. হাদীছ দিয়ে হাদীছের যৌক্তিক বিরোধ মীমাংসা করা হয়েছে।

১১. হিকমতপূর্ণ উপমা-উদাহরণ বেশি উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত’-এর আক্বীদা-আমলের দালীলিক আলোচনা মাধ্যমে এগুলির যথার্থতা বর্ণনা করা হয়েছে।

১৩. হাদীছের সূফীতাত্ত্বিক আলোচনা-ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪. নাবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মান-মর্যাদা এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণের বড়ই শান সহকারে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

১৫. হাদীছ শরীফ হতে বেশী বেশী মাসআলা বের করা হয়েছে।

১৬. সম্মানিত সাহাবা ও ওয়ালীগণের শান-মান বর্ণনা করা হয়েছে।

১৭. মানবীয় চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে চারিত্রিক বিষয়াদি বেশি উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮. সবচেয়ে বড় বিষয় হলো- সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে সর্বসাধারণ হাদীছ শরীফের মর্মার্থের আরো কাছে যেতে পারেন।[২]

এই গ্রন্থের ব্যাপারে লেখকের আরয হলো- আল্লাহপাক যেন এটিকে মিশকাত-এর মিরআত (প্রদীপের রক্ষাকবচ কাঁচ/চিমনী) করেন এবং কবুল করে তাঁর জন্য গুনাহের মার্জনা ও সাদক্বায়ে জারিয়া-এর মাধ্যম করেন। এর নামকরণ সম্পর্কে লেখক বলেন, আমি এর নাম প্রদানের জন্য করাচীর বিখ্যাত সূফী জনাব আফসার সাহেব সাবেরী-এর নিকট আবেদন জানিয়ে পত্র লিখি। কিছুদিন পর অর্থাৎ ২০ জিলক্বদ ১৩৭৮ হিজরী জুমাবার তাঁর চিঠি প্রাপ্ত হই; যাতে লেখা ছিল- ‘অসুস্থতার কারণে আমি এতোদিন এই মহান গ্রন্থের ঐতিহাসিক নাম বিষয়ে ধ্যান দিতে পারিনি। শেষে এক রাত্রিতে আমাকে স্বপ্নযোগে এর নাম বলা হয়েছে “যুল-মিরআত”। সুবহানাল্লাহ! কতইনা সুন্দর নাম! মিশকাতের সাথে

গাইরিহি বা দ্বাঈফ হয়ে থাকে। (সূত্র: শরীফুল হক্ব আমজাদী, মুফতী, মুহাম্মদ, নুযহাতুল ক্বারী শারহি সাহীহিল বুখারী, ফরীদ বুক স্টল, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; ২য় প্রকাশ ১৪২৮হি., খন্ড-০১, পৃ.নং-২৯।)

[১]- মিরআতুল মানাজীহ শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, খন্ড-০১,পৃ.নং-৭৯।

[২]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৫৬২-৫৬৪। এখানে গ্রন্থকার ৩১টির অধিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। আলোচনা অতি দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে তার সবকটি উল্লেখ করলাম না।

মিলে মিরআত। তিনি এই নামের সাথে মিল রেখে এর নাম রাখেন ‘যুল-মিরআত শারহি মিশকাত’।[১] আট খন্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থটি অন্যান্য ব্যাখ্যা গ্রন্থের তুলনায় সর্বদিক দিয়ে মর্যাদার আসনে সমাসীন।[২]

> বইটি ‘মিরআত শারহি মিশকাত’ শিরোনামে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান সাহেব বাংলায় অনুবাদ করেন। এটির প্রথম খন্ড ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম হতে ১২ রবিউল আউয়াল-১৪৩০হিজরী/২৬ফাল্গুন-১৪১৫বঙ্গাব্দ/১০মার্চ-২০০৯খ্রিষ্টাব্দ প্রকাশিত হয়। বাকী খন্ডগুলির অনুবাদ চলমান।

নাঈমুল বারী ফী ইনশিরাহ-ই বুখারী

(نعيم الباري فى إنشراح بخارى)

এটি হাকীমুল উম্মাতের আরেকটি অনবদ্য রচনা। বিশ্ববিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (র.আ.) রচিত ও সংকলিত জা‘মি আল-বুখারী’র আরবী ভাষায় রচিত টীকা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখা গ্রন্থ। এটি চার খন্ডে রচিত অপ্রকাশিত গ্রন্থ। হাকীমুল উম্মাত নিজে এটা জীবদ্দশায় প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর এক তৃতীয়াংশ পান্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ার কারণে তা প্রকাশ করে যেতে পারেননি।[৩] এর অবশিষ্ট পান্ডুলিপি হুজুরের ওয়ারিশগণের নিকট সংরক্ষিত আছে।

---

[১]- মিরআতুল মানাজীহ শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ (ভূমিকা),পৃ. নং- ১৫। মিরআত শব্দের শাব্দিক অর্থ- প্রদীপের ঘেরা যা চিমনী নামে পরিচিত। এটি বাইরের বাতাসকে প্রদীপের ভিতরে প্রবেশ করতে বাঁধা দেয়; যা প্রদীপকে নিভে যাওয়া থেকে রক্ষা করে থাকে। এই নামকরণের উদ্দেশ্য হলো দু’টি। যথা: ১. এই ব্যাখ্যা গ্রন্থ হাদীছ অস্বীকারকারী ও অবুঝ লোকদের আপত্তির প্রতিউত্তর হয়ে এর বিশুদ্ধতা রক্ষিত হবে এবং হাদীছের পারস্পরিক বিরোধ দূর করে আমলে স্বচ্ছতা আনয়ন করবে এবং ২. এটি মিশকাত শরীফের হাদীসসমূহের আয়না স্বরূপ; যা এই ব্যাখ্যা গ্রন্থের মাধ্যমে সহজে দেখা ও বুঝা যাবে। ঐ, পৃ.নং-১৫; https://ur.wikipedia.org/wiki/ مرآت_المناجیح

[২]- ঐ, পৃ.নং-২৪৮।

[৩]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৩৭।

ইজমাল ফী তারজুমাতি ইকমাল

(اجمال فی ترجمۂ اکمال)

(সাহাবা ও তাবিঈনগণের জীবনী)

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) কর্তৃক অনূদিত 'ইজমাল তরজুমা-ই ইকমাল' ১০৫ পৃষ্ঠার বইটি 'মিশকাতুল মাসাবীহ' এর লেখক ইমাম ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল্লাহ খতীব তিবরিযী আল-বাগদাদী (৭৪১হি:/১৩৪০খ্রি:)[১] কর্তৃক প্রণীত এবং মিশকাতের শেষে সংযোজিত আরবী ভাষায় রচিত 'ইকমাল'-এর উর্দূ ভাষান্তর। সাহাবী ও তাবেঈগণের সংক্ষিপ্ত, ক্ষেত্র বিশেষে অতি সংক্ষিপ্ত আবার বিশেষ কারও জীবনী একটু বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এই পুস্তিকায়।

বইটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখক বলেন, 'আমি এটি অনুবাদের সাথে সাথে কিছু অতিরিক্ত 'হাশিয়া ইজমাল' এবং অন্যান্য কিতাব হতে এতে যুক্ত করেছি। আমি এর নাম 'ইজমাল ফী তারজুমাতি ইকমাল' রাখলাম। এতে আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রথমে সাহাবী, তারপর তাবিঈ, এরপর মহিলা সাহাবীগণের নাম সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ আলোকপাত হবে'।[২] এতে ৪৯২ জন সাহাবী, ৬৬ জন মহিলা সাহাবী, ৪১১ জন তাবিঈ ও ১২ জন মহিলা তাবিঈসহ সর্বমোট ৯৮১ জন হাদীছ বর্ণনাকারীর[৩] সংক্ষিপ্ত জীবনী স্থান পেয়েছে। পরিশিষ্টে প্রিয় নাবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশনামা এবং আহলে বায়ত-এর পরিচিতি, তার সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণেরও বংশ পরিচিতি বর্ণনা করেছেন। সবচেয়ে আনন্দের তথ্য হলো- তিনি ইমাম আজম আবূ হানীফা নু'মান ইবনু ছাবিত আল-কুফী (৮০হি./৬৯৯খ্রি.-১৫০হি./৭৬৭খ্রি.)-এর মহিয়সী আম্মাজান, তাঁর পূণ্যবতী স্ত্রীর নাম এবং আহলে বায়তের সাথে তাঁর বংশীয় ও পারিবারিক জীবনের সংশ্লিষ্টতার তথ্য 'তারীখ-এ আয়নায়-এ তাসাউফ', 'মাজমাউল আ'রীফ' এবং 'হাশিয়া হুলিয়াতুল মুত্তাক্বীন' (ইরান হতে প্রকাশিত) নামক গ্রন্থের উদ্বৃতি সহকারে উপস্থাপন করেছেন।[৪]

লেখক পুস্তিকাটি রচনা শুরু করেন ২১ রমজান ১৩৮৮ হিজরী মুতাবিক ১২ ডিসেম্বর ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ রোজ: বৃহস্পতিবার এবং শেষ করেন ২৪ জিলহজ্ব ১৩৮৯ হিজরী মুতাবিক ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ রোজ: বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায়।[৫] এটি সর্বপ্রথম তারিখ বিহীন নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান হতে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে আলা হযরত নেটওয়ার্ক (Ala-Hazrzt Network) কর্তৃক প্রকাশিত।

---

[১] - তাঁর নাম: মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ, উপনাম: আবূ আব্দিল্লাহ, উপাধী: ওয়ালীউদ্দীন। তিনি সৈয়্যদুনা ওমার ইবনু খাত্তাব (রা.) এর বংশধর ছিলেন। খতীব তিবরিযী নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। নিজ সময়ের সেরা মুহাদ্দিস এবং বালাগাত-ফাসাহাত এর ইমাম ছিলেন। তাঁর জন্মসন অজানা। তিনি ৭৪১ মতান্তরে ৭৪৮/৭৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। (সূত্র: হানীফ গাঙ্গোহী, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-১৩৯-১৪০।)

[২] - আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, ইজমাল ফী তারজুমাতি ইকমাল, আলা হযরত নেটওয়ার্ক, তারিখ বিহীন, পৃ.নং-০১।

[৩] - ঐ।

[৪] - ইমাম আজম-এর মায়ের নাম: খাদীজা বিনতে ইমাম যায়নুল আবিদীন আলী আওসাত(৩৭হি./৩৮হি./৬৫৯খ্রি.-৯৪হি./৯৫হি./৭১৩খ্রি.) ইবনু ইমাম হুসাইন ইবনু মাওলা আলী মুরতাজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন এবং স্ত্রীর নাম: ফাতিমা মিসকীন বিনতে ইমাম জাফর সাদিক (৮০হি./৬৯৯খ্রি.-১৪৮হি./৭৬৫খ্রি.) ইবনু মুহাম্মদ বাকির ইবনু আলী যায়নুল আবিদীন ইবনু ইমাম হুসাইন ইবনু মাওলা আলী মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। মাতৃ ও বৈবাহিক সূত্রে তিনি নাবী পরিবারের সাথে যুক্ত। সুবহানাল্লাহ! ঐ, পৃ.নং-১০৩।

[৫] - ঐ, পৃ. নং- ০১ ও পৃ. নং- ৯৮।

ইলমুল মিরাছ

(علم الميراث)

‘ইলমুল মিরাছ’ বইটি হাকীমুল উম্মাতের লিখিত দ্বিতীয় গ্রন্থ।[১] এটি ভাষাগত বর্ণনা ও মাসাআলা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। তিনি এখানে মাসআলা সমূহ সংক্ষিপ্ত ভাষায় সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এটি ১৩৫২ হিজরীতে রচিত ৬৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি ছোট গ্রন্থ। তিনি এতে যে বিষয়সমূহ স্পষ্ট করেছেন তা হলো-

১. কুরআন বর্ণিত নির্ধারিত অংশের সুস্পষ্ট বর্ণনা।
২. আসহাবে ফরায়েজ তথা মৌলিক উত্তরাধিকারী ১২ জন। ০৮ জন নারী ০৪ জন পুরুষ এর বর্ণনা।
৩. যে সকল কারণে উত্তরাধিকারী বঞ্চিত হয় তার বর্ণনা।
৪. যে সকল কারণে উত্তরাধিকার হতে বাঁধা প্রাপ্ত হয় বা বের হয়ে যায় তার বর্ণনা।
৫. মাসআলা-এ রাদ্দ তথা মৃতের ‘যাবিল ফুরুয’[২]-এর নিকট অবশিষ্ট সম্পদ দ্বিতীয়বার ফিরে আসার বিস্তারিত বর্ণনা।
৬. একজন মৃতের অবশিষ্ট সম্পদ এখনো বন্টিত হয়নি; এর মধ্যেই একজন ওয়ারিশ মরে গেলে ঐ মৃতের সম্পদের কী বিধান হবে তার বর্ণনা।
৭. নাতি/পৌত্র থাকাবস্থায় ইসলামী শরী‘আতে নাতনি/পৌত্রী বা কন্যার কী অবস্থা হবে তার বর্ণনা।
৮. উত্তরাধিকার মাসআলায় ‘হারানো ব্যক্তি’ দ্বারা উদ্দেশ্য কী এবং তার সম্পদের কী অবস্থা হবে তার বর্ণনা।
৯. কয়েদী উত্তরাধিকারীর অবস্থার বর্ণনা। কয়েদী উত্তরাধিকারী যদি ধর্ম পাল্টিয়ে ফেলে তার বিধান কী হবে তার বর্ণনা।
১০. যে সকল ব্যক্তি আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে বা মাটিচাপা পড়ে মারা যায় তাদের বিধান কী হবে এবং তাদের সম্পদ কোন পদ্ধতিতে বন্টিত হবে/পাবে তার র্বণনা।[৩]
১১. যদি ব্যক্তি ধর্মত্যাগী হয়; চাই সে পুরুষ হউক বা নারী অথবা কোন এক শহরের সবাই ধর্মত্যাগী হয় তার বিধান বর্ণনায় হাকীমুল উম্মাত বলেন,

> “যে ব্যক্তি ধর্মত্যাগী হলো সে তার আত্মীয় হতে সম্পত্তি পাবে না; চাই সে আত্মীয় মুসলমান হউক বা ঐ আত্মীয়ও ধর্মত্যাগী হউক। অনুরূপভাবে কোন নারী ধর্মত্যাগী হলে সেও উত্তরাধীকার হতে বঞ্চিত হবে। হ্যাঁ! যদি (আল্লাহ রক্ষা করুন!) কোন শহরের সবাই ধর্মত্যাগী হলে তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হবে”।

এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। তবে এর প্রথম প্রকাশ বিষয়ে অনেক খোঁজ নেয়ার পরও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

---

[১]- মজলিস আল-মদীনাতিল ইলমিয়্যাহ (দাওয়াতে ইসলামী-শুবাহ ফয়যানে আউলিয়া) সম্পাদিত, ফয়যানে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী, বাবুল মদীনা, করাচী-পাকিস্তান; তারিখ বিহীন, পৃ.নং-৬৭।

[২]- ঐ সকল উত্তরাধিকারীদের বলা হয় যাদের জন্য পবিত্র কুরআনে মৃতব্যক্তির সম্পদ থেকে অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। (সূত্র: মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ আস-সাজাওয়ান্দী, প্রাগুক্ত,পৃ.নং-০৫।)

[৩]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২৮৬-২৮৮।

ইসলামী যিন্দেগী

(اسلامی زندگی)

ইসলামী যিন্দেগী (اسلامی زندگی) ১৬৬ পৃষ্ঠার ধর্মীয় আচার-আচরণ-ব্যবহার সম্পর্কিত দৈনন্দিন জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) রচিত একটি কিতাব। ‘এই বইটিতে দৈনন্দিন ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও শিষ্টাচারের সুদক্ষ বর্ণনা সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে এবং অপচয় বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি ও অজ্ঞতা প্রসূত বদ রসমের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, মানবজীবনের পরতে পরতে আসা আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানাদির সঠিক-সুন্নাতী পদ্ধতি কী হবে’।[১]

এই বইয়ে পাক-ভারতে পালিত অনুষ্ঠানাদি উল্লেখ পূর্বক তাতে প্রবিষ্ট মন্দ বিষয়সমূহকে নির্ণিত করেছেন। তারপর ইসলামের দৃষ্টিতে তার সঠিক আচারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[২] প্রচলিত অনুষ্ঠানাদি দুই প্রকারের, যার এক প্রকার শরী‘আতে জায়িয; দ্বিতীয় প্রকার ধ্বংসাত্মক। আর এজাতীয় রসম পালনের জন্য সুদী টাকা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।[৩] হারামের জন্য আবার হারাম কাজ! বইটি আজ হতে ৭৪ বছর পূর্বে লিখিত। তখনকার অবস্থা এরূপ হলে বর্তমানে কী চলতেছে তা তো আমরা দেখছিই। নাউযুবিল্লাহ! ছয়টি অধ্যায় ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর আলোচিত পরিশিষ্টে বিন্যস্ত বইটিতে লেখক কর্তৃক আলোচ্য বিষয়াদি হল-

১. আক্বীক্বা[৪] ও খৎনার[৫] ইসলামী পদ্ধতি,

---

[১] - আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-০৭।

[২] - আহমদ ইয়ার খান, মুফতী, ইসলামী যিন্দেগী, প্রারম্ভিকা (পেশ লফজ), মজলিস আল-মাদীনাতিল ইলমিয়্যাহ, দাওয়াতে ইসলামী, করাচী-পাকিস্তান, ১৪৩১হি./২০১০খ্রি.; পৃ.নং-১৬।

[৩] - ঐ।

[৪] - আকীকাহ (আরবী: عقيقة), আকীকা নবজাতক শিশুর জন্ম উপলক্ষে প্রাণি কুরবানীর একটি ইসলামী প্রথা। এটি মুসলমানরা ব্যাপকভাবে পালন করে এবং নবজাতকের জন্য একটি ছাগল বা ভেড়া জবাই করা এবং গরীবদের মধ্যে মাংস বিতরণ করা সুন্নাত হিসাবে বিবেচিত হয়। মুসলমানগণ সন্তানের মঙ্গলের জন্য এবং পরিবার ও বন্ধুদের জন্য একটি ভোজের আয়োজন করে। আকীকা হলো সুন্নাত আল মু’আক্কাদাহ (নিশ্চিত সুন্নত), এটি মোটেও ওয়াজিব নয়। যদি সন্তানের অভিভাবক সন্তানের জন্য একটি ভেড়া জবাই করতে সক্ষম হন, তবে তাদের এটি করা উচিত।

আবূ তালিব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের সপ্তম দিনে তাঁর জন্য আকীকাহ করেছিলেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের এই অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তারা জিজ্ঞাসা করেছিল “এটি কি?” যার জবাবে তিনি বলেন “আহমদের পক্ষে আকীকাহ”। তিনি মুহাম্মদের নাম “আহমদ” রাখেন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাতি হাসান ইবনে আলী এবং হুসেন ইবনে আলী উভয়ের জন্য যথাক্রমে একটি করে ভেড়া জবাই দিয়ে তাদের জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করেছিলেন; তাদের প্রসবের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ধাত্রীকে রানের গোস্ত দিয়ে দেওয়া হয়। আকীকার পশুর রক্ত দিয়ে বাচ্চাকে অভিষেক করা আরব পৌত্তলিকদের মধ্যে একটি প্রচলিত কাজ ছিলো আর এটা ইসলামে নিষিদ্ধ। (সূত্র: https://bn.wikipedia.org/wiki/ আকিকা)

[৫] - পুরুষ খৎনা বা পুরুষ লিঙ্গাগ্রচর্মচ্ছেদন বা পুংলিঙ্গাগ্রভাগচ্ছেদন বা পুংলিঙ্গ অগ্রত্বকচ্ছেদ (লাতিন circumcidere), অর্থ হল- “চারদিক থেকে কেটে ফেলা”। একটি অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে মানব শিশ্নের অগ্রচর্ম (প্রিপিউস) অপসারণ। এ প্রক্রিয়ায় সাধারণত, অগ্রচর্মটিকে ভাজ খুলে প্রসারিত করা হয় এবং পেনিস গ্ল্যান্স বা শিশ্নের গোলাকার অগ্রভাগ হতে অপসারণ করা হয়। ব্যাথা ও মানসিক চাপ কমাতে অনেক সময় আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় বা প্রচলিত এনেস্থেশিয়া দিয়ে অবশ করে নেয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, সাধারণ এনেস্থেশিয়া হল একটি উপায়, এবং কোন বিশেষ চর্মচ্ছেদন অস্ত্র ছাড়াই অস্ত্রপাচার সম্পন্ন করা যেতে পারে। প্রায়শই এটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে নবজাতক ও শিশুদের উপর ঐচ্ছিক শল্যচিকিৎসা হিসেবে সম্পাদন করা হয়, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে একে সমস্যা নিরাময় ও রোগ প্রতিরোধজনিত কারণে ডাক্তারি পরামর্শ হিসেবে নির্দেশ করা হয়। অসুস্থতাজনিত ফিমোসিস বা লিঙ্গের অগ্রচর্ম স্থায়ীভাবে সরু হওয়ার দরুন তা প্রসারিত না হওয়ার সমস্যা, স্থায়ী বালানোপস্থিটিস এবং দীর্ঘস্থায়ী মূত্রনালি জনিত প্রদাহের (ইউটিআই’স) জন্য এটি একটি চিকিৎসা। (সূত্র: https://bn.wikipedia.org/wiki/খৎনা)

খৎনার বিধান প্রসঙ্গে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “ নাভীর নিচের কেশ উত্তোলন, খৎনা করণ, মোচ কর্তন, বগলের কেশ উত্তোলন এবং নখ কর্তন করণ এই পাঁচটি বিষয় ইসলামের স্বভাবজাত বিষয়”। এই থেকে সমস্ত ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নিশ্চয়ই খৎনা ইসলাম সিদ্ধ বিষয়। এটা ইসলামী আদর্শের অন্তর্ভূক্ত। তবে এর হুকুম কী হবে তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম মালিক, ইমাম আওজাঈ এবং ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-ক্বাত্তান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন)-এর মতে- খৎনা করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আজম আবূ হানীফা, ইমাম হাসান বাসরী, ইমাম মালিক এর অন্যমতে- খৎনা পুরুষের

২. বিবাহের আচার-ব্যবহারের বর্ণনা,
৩. নতুন ফ্যাশনের কুফল,
৪. শিশু পরিচর্যা ও প্রতিপালনের ইসলামী পদ্ধতি,
৫. বার মাসের বরকতময় তারিখ সমূহের ধারাবাহিক আমল ও ইবাদতের বর্ণনা এবং,
৬. ব্যবসায়িক নিয়ম-নীতি।[১]

বইটির শুরুতে প্রকাশনা ও প্রকাশকের মন্তব্য ও লেখক কর্তৃক মুসলিম জীবনাচার ও দূর্বলতার এবং দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাসহ এর প্রতিকার সম্পর্কিত তত্ত্ব-তথ্য সম্বলিত মুখবন্ধ স্থান পেয়েছে।[২]

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লার মুহাম্মদী কুতুবখানার মালিক অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান সাহেব এর অনুবাদ করে নিজ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হতে জুন-১৯৯৭ সালে প্রকাশ করেন।

জন্য সুন্নাত, নারীর জন্য সম্মানের বিষয়। ইমাম কাজী আয়ায বলেন, খৎনা ইমাম মালিক ও অধিকাংশ ইমামের মতে- সুন্নাত। এর বর্জনকারী পাপী হবে। মালিকীগণ এটাকে ফরয এবং মুবাহ-এর মাধ্যবর্তী মনে করেন। ইমাম মৌসুলী তাঁর শারহুল মুখতার গ্রন্থে বলেন, খৎনা পুরুষের জন্য সুন্নাত এবং ইসলামের স্বভাবগত কর্ম। এটি মহিলাদের জন্য সম্মানের বিষয়। যদি কোন দেশের অধিবাসী মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা খৎনা করবে না তবে, ইমাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কেননা, খৎনা ইসলামের নিদর্শন এবং বৈশিষ্ট্যভূক্ত। (সূত্র: https://mawdoo3.com/ما_حكم_الختان_في_الإسلام)

[১]- ইসলামী যিন্দেগী, পৃ.নং- ০৩,০৪।

[২]- ঐ, পৃ.নং-০৭-১৬।

ফাতওয়া-এ নাঈমীয়্যাহ

(فتوی نعیمیہ)

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) রচিত এই গ্রন্থটি ইসলামী ফিক্বাহ শাস্ত্রের অন্যতম আকর। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মত এই ফাতওয়ার গ্রন্থটিও অতুলনীয়। তিনি এতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসআলা সমূহ পবিত্র কুরআন-হাদীস, ফিকাহ-তাফসীর এবং সুদীর্ঘ অধ্যয়নের মাধ্যমে সমাধান করেছেন। হাকীমুল উম্মাত প্রায় চুয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত ফাতওয়া প্রদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তাঁর ফাতওয়ার সনদ আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী-আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরেলভী-শাইখ আব্দুর রহমান হানাফী মক্কী হয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মসউদ (রা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হলো-

১. ফিক্বহে হানাফীর গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনবিধিত গ্রন্থাবলীর নিরিখে তিনি ফাতওয়া প্রদান করেছেন।
২. নিজস্ব মতামতকে প্রাধান্য দেননি।
৩. ক্ষেত্র বিশেষে উপমা-উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে মাসআলার সাধারণ বোধগম্যতা সৃষ্টি করেছেন।
৪. আক্বীদাগত মাসআলার ক্ষেত্রে কোনরূপ শীথিলতা প্রদর্শন না করে পবিত্র শরী'আতের আলোকে অত্যন্ত কঠোরতার সাথে বাতিল মতবাদের খন্ডন করেছেন।
৫. নতুন সমস্যা হউক বা পুরাতন সব মাসআলার সুস্পষ্ট ও প্রশান্তিমূলক উত্তর প্রদান করেন।
৬. ফাতওয়ার কোথাও সন্দেহ যুক্ত কথা উল্লেখ করতেন না।
৭. তাঁর ফাতওয়াগুলিতে আল্লাহ পাকের শান, তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণকীর্তন এবং আল্লাহ পাকের প্রিয়তমদের প্রশংসায় ভরপুর ছিল।[১]

বইটি সম্পর্কে ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত 'ফাতওয়া ও মাসাইল' গ্রন্থে বলা হয়েছে- 'ফাতাওয়ায়ে নাঈমিয়া' নামক গ্রন্থখানা তাঁর অক্ষয় কীর্তি'।[২] এটির এখনো বঙ্গানুবাদ হয়নি। সাহিবযাদা মুফতী মুহাম্মদ ইক্তেদার আহমদ নঈমী 'র তত্ত্বধানে গ্রন্থটি নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান হতে তারিখ উল্লেখ ব্যতিত প্রথম প্রকাশিত হয়।

---

[১] - আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.ং-৭১।
[২] - সম্পাদনা পরিষদ, ফাতওয়া ও মাসাইল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ ডিসেম্বর-২০০৯খ্রি., খন্ড-০১, পৃ.নং-১৬২।

আসরারুল আহকাম বি-আনওয়ারিল কুরআন

(اسرار الأحكام بأنوار القران)

‘আসরারুল আহকাম বি-আনওয়ারিল কুরআন’ বইটি মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (র.আ.) কর্তৃক ইসলামী আক্বীদা, শরয়ী‘ মাসায়িল এবং তরীক্বতের বিধি-বিধান বিষয়ে মানব মনে যতরকম প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে বা হতে পারে তা উপস্থাপনের মাধ্যমে তদ্‌সশ্লিষ্ট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে প্রশ্নোত্তর আকারে পাঠকমহলকে সহজ-সাবলীল ভাষায় বুঝানোর সফল প্রচেষ্ট চালানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- ইসলাম- কালিমা তাইয়্যেবাহ, নামায-রোযা, হজ্জ-জিয়ারত, জিহাদ-শাহাদাত, বিবাহ-তালাক, ইসলামী শাস্তিসমূহ, কবর-দাফন-কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম, মু’জিযা এবং তাক্বদীর সংক্রান্ত মাসআলা গুঢ় রহস্যসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।[১] ১১৭ পৃষ্টার এই বইটি সোমবার, ২১ জুমাদাল উলা-১৩৬৮ হিজরীতে শুরু করে ১৩৬৮ হিজরীর ২৫ জুমাদাল আখির, সোমবার দিবসে রচনা শেষ করা হয়। এটি নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান হতে প্রথম প্রকাশিত হয়।[২]

বইটি ‘শরয়ী বিধানের গুঢ় রহস্য’ শিরোনামে মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজামী কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হয়ে আল-মদীনা প্রকাশনী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম হতে ১২ রমযান, ১৪৩৩ হিজরী ও ১৭ শ্রাবণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ মুতাবিক ০১ আগস্ট ২০১২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বইটির উপযোগিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনুবাদক বলেন, ‘আসরারুল আহকাম হাকীমুল উম্মাতের একটি অনবদ্য, বিস্ময়কর, যুগোপযোগি বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টি। ইসলামী শরী‘আতের বিধি-বিধান অন্ধভাবে মেনে নেয়ার নাম নয়। এগুলোর প্রত্যেকটিতে বিজ্ঞানসম্মত রহস্য নিহিত আছে। শরী‘আতের উপযোগিতা কোনকালেই অকার্যকর হবেনা’।[৩] এই বইটি পাঠান্তে পাঠক ইসলামী শরী‘আতের বিধিবিধানগুলির বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা পারবেন এবং ইসলাম ধর্মের কালোত্তীর্ণতা প্রমাণিত করতে পারবেন। আল-হামদুলিল্লাহ!

---

[১]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, , পৃ.নং-৩০৯।

[২]- আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, আসরারুল আহকাম বি-আনওয়ারিল কুরআন, নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; জুন-২০০৬ খ্রি.; পৃ.নং-১১৬।

[৩]- মুজিবুর রহমান নেজামী, মাওলানা, মুহাম্মদ, শরয়ী বিধানের গুঢ় রহস্য (অনূদিত), আল-মদিনা প্রকাশনী, আন্দরকিল্লা-চট্টগ্রাম; ১২ রমযান-১৪৩৩ হিজরী, ১৭ শ্রাবণ-১৪১৯ বঙ্গাব্দ, ০১ আগস্ট-২০১২খ্রি.; পৃ.নং-০১।

সফর নামা (সম্পূর্ণ)

(حضرت حکیم الامت کے سفرنامے)

(সফর নামা হজ্ব ও যিয়ারত প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খন্ড একত্রে)

হাকীমুল উম্মাত বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্‌সির ও বিশিষ্ট পর্যটক আল্লামা আল-হাজ্ব আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (র.আ.) কর্তৃক পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা, ইরান, ইরাক, কুয়েত, নজদ, জর্দান, ওমান, হিজাজ, তায়িফ, মক্কা শরীফ, মাদীনা শরীফ এবং বায়তুল মাকদাস শরীফ, বেথেলহেমসহ অন্যান্য স্থানের চাক্ষুষ ভ্রমণকাহিনী তারিখ, বার সময়সহ বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি বর্ণিত স্থানসমূহের ভ্রমণকারীদের জন্য সত্যিকারের গাইড বুক হিসেবে কাজ করবে। বিশেষত হজ্জ-ওমরাহকারীদের জন্য এই ভ্রমণ কাহিনীটি তথ্য-উপাত্ত যেমন সরবরাহ করবে তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের বাস্তব চিত্র যিয়ারতকারীদের সামনে তুলে ধরে এর বিধি-বিধান সমূহও সরবরাহ করবে।

এই সফরনামাটি হাকীমুল উম্মাতের তৃতীয় হজ্ব সফর ২৫ শাওয়াল ১৩৭৩ হিজরী মুতাবিক ২৭ জুন ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পাকিস্তানের ‘হজ্জেপাক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি’-এর শেয়ারধারী আলিম-ওলামা এবং হাজীদের ৩০০ জনের বিশাল দলের সড়ক পথে পবিত্র হজ্ব যাত্রার মাধ্যমে এই ভ্রমণনামা শুরু হয়ে ০২ সফর ১৩৯০ হিজরী মুতাবিক ১৮ এপ্রিল ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৭ম হজ্ব সম্পাদন করে নিজ হিযরতস্থল এবং সর্বশেষ বিশ্রামাগার (রওজা মুবারক) পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৭ বছর ব্যাপী পথপরিক্রমার নির্ভরযোগ্য ভ্রমণ ইতিহাস। এই গ্রন্থের এখনো ভাষান্তর রচিত হয়নি।

প্রথম খন্ড:

(সড়ক পথে পাকিস্তান থেকে ইরান, ইরাক, কুয়েত হয়ে সৌদি আরব)

যাত্রা শুরু: ২৫ শাওয়াল ১৩৭৩ হিজরী মুতাবিক ২৭ জুন ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ রোজ: রবিবার ১০:৪৫ মিনিটে রাওয়ালপিন্ডি-পাকিস্তান হতে শুরু হয়।

যাত্রা শেষ: ০৯ সফর ১৩৭৪ হিজরী মুতাবিক ০৮ অক্টোবর ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ রোজ: জুমাবার সকাল ১১:১৫ মিনিটের সময় জামে মসজিদ, চক, গুজরাট-পাকিস্তানে এসে শেষ হয়।

প্রায় ০৩ মাস ১৪ দিনের গুজরাট হতে গুজরাট যাওয়া-আসা পর্যন্ত ০৯ হাজার মাইলের বিশাল পথের সফর ছিল এটি। এই অংশটি হাকীমুল উম্মাত ১৫ মুহার্‌রম ১৩৮১ হিজরী রোজ: শুক্রবার লেখা শেষ করেন।[১]

এই সফরের বিশেষত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমি এই সফরে দুইটি বিষয় আশ্চার্যজনকভাবে লক্ষ্য করেছি-

এক: আমার ভ্রমণের পথ গুজরাট হতে মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত এক ইঞ্চি জায়গাও কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের ছিলনা। পুরো ৩৭৫৪ মাইল দীর্ঘ স্থলপথের রাষ্ট্র- মুসলিম কর্তৃত্বাধীন। আল-হামদুলিল্লাহ!

দুই: ‘এই সকল ইসলামী ও মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দু-শিখ অবাধে বসবাস করছে এবং নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। ইরানের মাশহাদ শহরের সবচেয়ে বড় ফার্ম রামজি মৌলচাঁদ-এর। কিন্তু ঐসকল অমুসলিমদের অনুভবই নেই যে তারা নিজ দেশে না মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করছে। এখানে শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় প্রত্যেকদিন কোন না কোন ইস্যু ধরে

---

[১]- আহমদ ইয়ার খান, মুফতী, সফর নামা, নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; জুন-২০০৬ খ্রি., খন্ড-০১, পৃ.নং-১৬৪-৬৫।

ভারতে সাধারণ মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে। এই দেশগুলো হতে ভারতের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত'।[১] সত্যিই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চমৎকার এই উদাহরণ শুধু মুসলমানরাই দেখাতে পারে।

এই সফরের উল্লেখযোগ্য দিক বর্ণনা করে হাকীমুল উম্মাত বলেন,

১. অনেক বুযর্গ ওলামার সমন্বিত সফর ছিল এটি। যাদের সঙ্গ অত্যন্ত বরকত মন্ডিত ছিল।
২. পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, কুয়েত, নজদ এবং হিজাযের সুপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করা হয়।
৩. বুযর্গানে দ্বীন- বিশেষ করে হযরত সৈয়্যদুনা মূসা আলাইহিস সালাম, মু'মিনদের খলীফা সৈয়্যদুনা আলী মুরতাদ্বা (রা.), তাঁরই প্রিয় পুত্র শহীদ সর্দার সৈয়্যদুনা ইমাম হুসাইন (রা.), বিশিষ্ট সাহাবী হযরত তালহা ইবনু ওবাইদুল্লাহ (রা.), বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর (রা.), ইমাম মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রা.), হযরত খাজা হাসান বাসরী (রা.), শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (রা.), সুলতানুল আরিফীন হযরত বাইযীদ বিস্তামী (রা.), হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন আত্তার (রা.) সহ অনেক বুযর্গের মাযারের জিয়ারত নসীব হয়। ওমার খৈয়াম, আবুল কাসেম ফেরদৌসীসহ পার্সীভাষার বিদগ্ধ সাহিত্যিক-পন্ডিতগণের মাকবারাহ যিয়ারতও হয়।
৪. হাজীগণের সাথে বড়ই প্রেমসহকারে পাহাড়-পর্বত, গিরি-দরি, শ্যামল সমতল-বিরান মরুতল অতিক্রমকরে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রণয়ে গমন সত্যিই অবিস্মরনীয় ছিল।
৫. বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রের ভাইদের সাথে সাক্ষাত এবং পরস্পরের ভাব বিনিময়। একে অপরকে বুঝা এবং আপন দেশের সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার সৌভাগ্য নসীব হয়। ইরান, ইরাক, কুয়েত এবং হিজাযের মুসলমানদের মনে পাকিস্তান ও এদেশের মুসলমানদের জন্য গভীর প্রেম ও চেতনা বোধ লক্ষ্য করেছি। অনেকেই পাকিস্তানী মুদ্রাতে চুমু খেত। পাকিস্তানের অবস্থা শুনে কেঁদে ফেলতেন। স্মৃতিস্বরূপ আমাদের মুদ্রার সাথে তাদের মুদ্রার বিনিময় করতেন এবং বলতেন- 'আমাদের স্মৃতি তোমাদের কাছে, তোমাদের স্মৃতি আমাদের কাছে বন্ধুত্বের স্মারক হয়ে থাকবে'।
৬. তায়েফে সৈয়্যদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.)-এর মাযার যিয়ারত এবং 'জাবাল গাযালাহ'[২]-এর মনোরম দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়।
৭. শিরি-ফরহাদের শহর, মজনুর এলাকা-লাইলির আবাসস্থল যা সাধারণ হাজ্বীদের দ্বারা দেখা সম্ভব হয়না তা দেখার সুযোগ হয়।[৩]

এই খন্ডের শেষে ১৬৬ হতে ১৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ১৫ পৃষ্ঠায় হজ্ব-ওমরাহ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা ও মাসআলা আলোচিত হয়েছে। যা এই ভ্রমণ বৃত্তান্তকে ইতিহাস নির্ভর ভ্রমণকাহিনী থেকে উঠিয়ে ফিক্বহী ভ্রমণ গাইডে পরিণত করেছে। ১৮৩ পৃষ্ঠার এই বইটি হাকীমুল উম্মাতের অনন্য প্রতিভারই স্বাক্ষর এবং ইসলামী সাহিত্য ভান্ডারে নবতর সাহিত্য যোজনা।

---

[১]- ঐ, পৃ.নং-১৬৫।

[২]- জাবাল অর্থ: পাহাড়, আর গাযালাহ অর্থ: হরিণ। ইয়াহুদীর ফাঁদে আটকা পড়া হরিণী কর্তৃক নাবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জামিনদার করা বিষয়ের ঐতিহাসিক ঘটনার স্বাক্ষী এই পাহাড়। এজন্য এর নাম হয়ে যায়- জাবাল গাযালাহ বা হরিণির পাহাড়।

[৩]- সফর নামা, প্রাগুক্ত, খন্ড-০১, পৃ.নং-০৪-০৫।

দ্বিতীয় খন্ড:

(বিমানে পেশোয়ার, লাহোর-করাচী হয়ে জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ)

যাত্রা শুরু: ০৩ রামদ্বানুল মুবারক ১৩৮৩ হিজরী মুতাবিক ১৯ জানুয়ারি ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ রোজ: রবিবার ঠিক দুপুর দু'টা বাজে গুজরাট-পাকিস্তান হতে শুরু হয়।

যাত্রা শেষ: ৩০ মুহার্‌রাম ১৩৮৪ হিজরী মুতাবিক ১০ জুন ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ রোজ: বুধবার সন্ধ্যা ০৫:১৫ মিনিটের সময় জামে মসজিদ, চক-পাকিস্তানে এসে শেষ হয়।

প্রায় ০৩ মাস ২৭ দিনের গুজরাট হতে গুজরাট যাওয়া-আসা পর্যন্ত ০৩ মাস ৩ দিন মাদীনা তাইয়্যেবাহতে, ১৪ দিন হজ্জ্ব উপলক্ষে মক্কা শরীফে, ০২ দিন বায়তুল মাক্বদাস ও দামেশ্‌ক্বে এবং অবশিষ্ট ০৬ দিন বাগদাদ শরীফে অতিবাহিত করেছেন (বাকি দুইদিন যাওয়া-আসায় খরচ হয়)। এই অংশটি হাকীমুল উম্মাত ১৯ রবিউস সানী ১৩৮৪ হিজরী মুতাবিক ২৮ আগস্ট ১৯৬৪ সালের রোজ: শুক্রবার লেখা শেষ করেন।[১]

এই সফরের উল্লেখযোগ্য দিক হল-

১. এই সফরে বিমানের টিকিট নিয়ে বেশ ঝামেলা হয়। আল্লাহর রহমতে পরিশেষে সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। বিমানেই ওমরার ইহরাম বাঁধতে হয়।

২. মক্কা শরীফে- জাবাল নূর, আরাফা, মীনা, মুযদালিফা, জাবাল হেরা, জান্নাতুল মু'আল্লাহ কবরস্থান এবং মদীনা মুনাওয়ারায়- মদীনা তাইয়্যেবাহ, আবওয়া, খায়বার, বদরসহ বরকতমন্ডিত স্থান সমূহের সেই সময়ের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

৩. হজ্জ্ব ও যিয়ারতের কার্যক্রম শেষ করে সৌদি আরব হতে ১২ মুহার্‌রম ১৩৮৩ হিজরীতে ওমান, জর্দান, ফিলিস্তিন, সিরিয়া হয়ে ইরাক গমন।

৪. ওমানের রাজপ্রাসাদ, হুসাইনিয়্যাহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং জর্দানে প্রবেশ করে আল-বাহরুল মাইয়্যাত (Dead Sea- যাকে বাহরে লুত ও বলা হয়; যার পানিতে কোন প্রাণি নেই এবং কোন প্রাণি ডুবেও না) তা দেখেন এবং এর পানির স্বাদ গ্রহণ করেন। রাজধানী হতে ৬৩ কিলোমিটার দূরে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মাযার জিয়ারত করেন। তাঁর মাযার মুবারক সাড়ে পঞ্চাশ হাত লম্বা এবং আট ফিট উঁচু। সুবহানাল্লাহ!

৫. এর পর ফিলিস্তিন গমন করে প্রথমে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গির্জা 'বায়তুল্লাহাম' (Bathlehem) ঘুরে ঘুরে দেখেন। এর পাশেই হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মস্থল, মৃত খেজুর বৃক্ষের স্থান- যে গাছ জীবিত হয়ে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে খাবার প্রদান করেন তা দর্শন করেন। এর পর 'মসজিদে খলীলুর রহমান' যা বায়তুল মাক্বদাস হতে উত্তর-পশ্চিমে ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত তা দেখতে যান। এই মসজিদের নীচে 'গারে আম্বীয়া' নামক স্থানে ৭৫ হাজার নাবী (আ.)-এর মাজার যিয়ারত করেন যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) এবং তাঁর স্ত্রী বিবি রুফক্বাহ (রা.), হযরত ইয়াকুব (আ.) এবং তাঁর স্ত্রী বিবি লায়ীক্বাহ (রা.) ও হযরত ইউসুফ (আ.) এর মাযার উল্লেখযোগ্য। তারপর 'বায়তুল মাক্বদাস' গমন করে তার যিয়ারত, হযরত যাকারিয়া (আ.), হযরত সুলাইমান (আ.)-এর মাযার যিয়ারত করেন। সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মি'রাজ রজনীতে নামাযের স্থান যিয়ারত করেন।

৬. পরদিন দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দামেশ্‌কে শাইখুল আকবার ইমাম মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রা.), আব্দুল কাদির জাজায়িরী (রা.), শাহ আব্দুল গাণী আন-নাবলুসী (রা.),

---

[১]- সফর নামা, খন্ড-০২, পৃ.নং-৩১৪।

সৈয়্যদুনা ইমাম হুসাইন (রা.)-এর বোন হযরত যায়নাব বিনতে আলী (রা.) ও কন্যা বিবি সকীনা, বিবি জয়নাব, বিবি উম্মে কুলসুম (রা.), হযরত বিলাল বিন রিবাহ হাবশী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর (রা.), হযরত মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.), হযরত উবাই ইবনু কা'আব (রা.), হযরত খাওলা বিনতে আযদার (রা.), নাবী হযরত ইয়াহইয়া (আ.), হযরত সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়্যূবী (রা.) হযরত সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী (রা.), হযরত আবুদ দারাদ (রা.), চল্লিশ আবদালের পাহাড় এবং হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র হাবীলের হত্যাস্থল যিয়ারত করার সৌভাগ্য নসীব হয়।

৭. ২৮ মে ১৯৬৪ সালে তিনি বাগদাদ পৌঁছান। প্রথমেই আজমিয়্যাহ মহল্লাতে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা.)-এর মাযার যিয়ারত করেন। তার পর ইমাম জাফর শিবলী (রা.), ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রা.), ইমাম কাজী আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম (রা.), ইমাম মুসা কাজিম (রা.), গাউছে পাকের শিক্ষক শাইখ সিরাজুদ্দীন আবূ হাফস উমার ইবনু আলী আল-মুকরী (রা.), ইমাম আবূ হামিদ মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী (রা.), ইমাম মুসলিম ইবনু আক্বীল (রা.) এবং তাঁর বংশধর হযরত 'আউন ও হযরত মুহাম্মদ (রা.)-এর মাযার জিয়ারত করেন। ৩১ মে শনিবার, কারবালায় যিয়ারতে যান। এখানে একই স্থানে সৈয়্যদুনা ইমাম হুসাইন (রা.), ইমাম আলী আকবার (রা.), সৈয়্যদ ইবরাহীম ইবনু মুজাব বিন ইমাম মুসা কাজিম (রা.), হযরত হাবীব ইবনু মাযহার-এ আলম (রা.) ইমাম কাসিম ইবনু ইমাম হাসান (রা.) সহ ৭২ জন শহীদে কারবালার মাযার যিয়ারত করেন। পাশেই হযরত হুর ইবনু ইয়াযীদ রিয়াহী (রা.) যিয়ারত করেন। এরপর নাজাফে সৈয়্যদুনা ইমামুল মুসলিমীন আমিরুল মু'মিনীন আলী ইবনু আবী তালিব (রা.) রওজা মুবারক যিয়ারত করেন। কিছু দূরেই হযরত নূহ (আ.)-এর চুলা যেটা হতে পানি উঠে তুফান-জলোচ্ছাস হয়েছিল তা দর্শন করেন। এরপর হযরত হানী ইবনু উরওয়া (রা.) (যিনি কুফাতে ইমাম মুসলিম (রা.)কে আশ্রয় দেয়ার কারণে তাঁর সাথে শহীদ হন) এবং বিবি রহিমা (হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর স্ত্রী)-এর মাযার যিয়ারত করেন। কূফার নিকটে 'লবে দরিয়া' নামক স্থানে হযরত ইউনুস (আ.)-এর মাছের উদর হতে উগরানোর স্থান, বাবেল শহরে নমরুদের সিংহাসনস্থল, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নির্মিত অগ্নিকুন্ডস্থল, পরে বাগদাদের বিশাল লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন। ০১ জুন সোমবার, হযরত সালমান ফার্সী (রা.), হযরত হুজাইফাতুল ইয়ামান (রা.), হযরত জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.), ইমাম তাহির ইবনু ইমাম জয়নুল আবিদীন (রা.), কিসরা বাদশার ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজমহল, ইমাম শাইখ শিহাবদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রা.) ইমাম মারুফ আল-কারখী (রা.), সাক্বিয়্যাহ আল-হাজ্ব (হাজীগণের পানী সমস্যা দূর করার নিমিত্তে খাল খননকারীনি) যুবাইদা (রা.) (বাদশা হারুনুর রাশীদের স্ত্রী), হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রা.) এবং হযরত বেহলুল দানা (রা.)-এর মাযার যিয়ারত করেন। বাগাদাদ শহর এবং এর আশপাশে শাইখ আবদুল জব্বার ইবনু আব্দুল কাদির জিলানী (রা.), ইমাম বিশির হাফী (রা.), রাবেয়া বাসরী (রা.), শাইখ হাম্মাদ ইবনু আবী হানীফা (রা.), শাইখ ইবরাহীম আদহাম (রা.), শাইখ মানসুর হাল্লাজ (রা.), শাইখ আহমদ কাবীর রিফাঈ (রা.), মুহাদ্দিস ইমাম আবূ শাইবা (রা.), মৌসুলে হযরত ইউনুস (আ.) ও ইমাম সৈয়্যদ তাক্বী (রা.) মাযার যিয়ারত করেন।

৮. এই সফরে তিনি অসংখ্য নাবী-রাসূল, আলিম-আউলিয়া এবং বরকতময় স্থানের যিয়ারত করে তাঁদের রুহানী তাওয়াজ্জুহ অর্জন করেন। সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ পরিদর্শন করে নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর জন্য 'সফর নামা' নামে জ্ঞানের বিশাল এক খোরাক তৈরি করেন। আল-হামদুলিল্লাহ![১]

---

[১]- সফর নামা, খন্ড-০২, পৃ.নং-২৭৩-৩০৩।

১৩০ পৃষ্ঠার এই খন্ডের শেষ ০৩ পৃষ্ঠায় হাকীমুল উম্মাত হাজ্বীগণ ও যিয়ারতকারীগণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। বিশেষত, দুই হারামের আদব রক্ষা করে চলার সুপরামর্শ প্রদান করেন। কারণ বেয়াদবীর কারণে সকল ইবাদত নষ্টতো হবেই সাথে ঈমান ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আল্লাহপাক সকলকে আদব রক্ষা করে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

তৃতীয় খন্ড:

(গুজরাট হতে মোটর গাড়ি করে করাচী এবং বিমানে করাচী হয়ে জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ)

যাত্রা শুরু: ২৮ শা'বান ১৩৮৯ হিজরী মুতাবিক ১০ নভেম্বর ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ রোজ: রবিবার ঠিক বিকেল তিনটা বাজে গুজরাট-পাকিস্তান হতে যাত্রা শুরু হয়।

যাত্রা শেষ: ০২ সফর ১৩৯০ হিজরী মুতাবিক ০৮ এপ্রিল ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ রোজ: বুধবার দুপুর ০১:২৫ মিনিটের সময় জা'মে মসজিদ, চক-গুজরাট, পাকিস্তানে এসে শেষ হয়।

> প্রায় ০৫ মাসের গুজরাট হতে গুজরাট যাওয়া-আসা পর্যন্ত প্রথমে ৩ দিন মক্কা শরীফে ০২ মাস ২৫ দিন মাদীনা তাইয়্যেবাহতে, ০৮ দিন হাজ্ব উপলক্ষে আবার মক্কা শরীফে, হাজ্বের পরে পুনরায় ০১ মাস ১৫ দিন মাদীনা তাইয়্যেবাহতে অতিবাহিত করেছেন (বাকী দিনসমূহ যাওয়া-আসায় খরচ হয়)। এই অংশটি হাকীমুল উম্মাত কর্তৃক গ্রন্থবদ্ধ করার কোন সন-তারিখ শেষে উল্লেখ করা হয়নি।[১]

এই সফরের উল্লেখযোগ্য দিক হল-

১. এই বার তিনি মসজিদে নাবাভী শরীফে ই'তিক্বাফ থাকার এবং ঐ অবস্থায় দরস ও তাফসীরুল কুরআন পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।
২. হাকীমুল উম্মাত এই সফরে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে হাতের হাঁড় কনুই বরাবর ভেঙ্গে যায়। কিন্তু আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উসীলায় প্লাস্টার ছাড়াই তিনি সুস্থ হয়ে যান।
৩. ওহুদ শরীফে সৈয়্যদুশ শুহাদা আমীর হামযাহ (রা.), হযরত মুস'আব বিন ওমাইর (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রা.)সহ শোহদা-এ ওহুদের মাযার জিয়ারত করেন।
৪. এই সফরে তিনি মা হযরত আমীনা বিনতে ওয়াহ্হাব (রা.)-এর নামে ওমরাহ করেন এবং 'আবওয়া' নামক স্থানে তাঁর মাযার শরীফ যিয়ারত করেন।
৫. পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই জাহাজের হাজীদের জলবসন্ত রোগ হওয়ার কারণে তাদের 'আরাফায় অবস্থান' আলাদাভাবে করা হলেও 'তাওয়াফ-এ যিয়ারাত' (ফরয তাওয়াফ) করতে দেয়া হয়নি। সৌদিরা এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে তাদের ১৪ দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়ে দেন।
৬. হাকীমুল উম্মাত বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ করতেন যাতে ওয়াহাবী-দেওবন্দীদের আক্বীদা-বিশ্বাসকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে ছাড়তেন। তিনি হেরম শরীফে লাউডস্পিকারে নামায পড়ানোর কারণে সেখানে জামা'আত না পড়ে নিজ হোটেলেই জামা'আত সহকারে নামায পড়তেন। তাঁর মতে লাউডস্পিকারে নামায শুদ্ধ হবে না। এই দুই ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কওমী-দেওবন্দীরা তা হুকুমতে জানালে পুলিশ এসে তা বন্ধ করে দেয়।

---

[১]- সফর নামা, খন্ড-০২, পৃ.নং-৩৮৭।

৭৩ পৃষ্ঠার এই খন্ডের পরতে পরতে নাবী প্রেমের বর্ণনা পাঠকের মনকে আপ্লুত করে তুলবে। মাদীনার মুনীবের মিলনে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জাগাবে মনে গহীনে। এই সফর নামাতেও হাকীমুল উম্মাত হাজ্বীগণ ও যিয়ারতকারীগণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। বিশেষত, হারামে মাদীনার বাসিন্দাগণের ওয়াদারক্ষা, আমানতদারিতা এবং সৎমনোভাবের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করেন। মাদীনাবাসীগণ এমন হবেই না বা কেন? সকল গুণের পূর্ণতাদানকারীকে সামনে নিয়ে যাদের নিত্য বসবাস তাঁরা তো সৎগুণের আধাঁর হবেনই। আল্লাহপাক এই বইয়ের পাঠকে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণে গুণান্বিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!
বইটি মূলভাষা উর্দূতে তিন খন্ড একত্রে নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান হতে জুন-২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়।

মাওয়াইজ-ই নাঈমীয়্যাহ

(مواعظ نعیمیہ)

এই ওয়াজ সংকলনটি হাকীমুল উম্মাতের ছাত্র পাবলিক হাইস্কুল, গুজরাট, পাঞ্জাবের ফার্সী শিক্ষক মাওলানা হাফিজ মুহাম্মদ আরিফ সাহেব কর্তৃক সংকলিত হয়। আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় যে ওয়াজ করেছেন তা হতে ৫৯টি ওয়াজ-এর কলমীরূপ হলো এই কিতাব। বইটিকে সংকলক তিন অংশে বিভক্ত করে প্রকাশ করেছেন। প্রথম অংশে ২৯টি, দ্বিতীয় অংশে ২০টি এবং তৃতীয় অংশে ১০টি ওয়াজ-এর বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।[১] বক্তা হিসেবে তিনি অত্যন্ত সহজভাষী ও উপমা নির্ভর বক্তা ছিলেন। তাঁর ওয়াজ সম্ভারে সংকলিত বক্তব্যের কিছু বৈশিষ্ট্য হলো-

১. তাঁর বক্তব্য যেন পবিত্র কুরআনেরই তাফসীর।
২. নানাদিক ব্যাখ্যাসহ হাদীছ শরীফের মর্মকথা উঠে আসত আলোচনায়।
৩. বক্তব্য আক্বলী যুক্তি এবং তথ্য-প্রমাণে ভরপুর থাকত।
৪. স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী বিষয় ভিত্তিক শে'র (কবিতা) যুক্ত করে ওয়াজ পরিবেশন করতেন।
৫. প্রয়োজনানুসারে ঘটনাও বর্ণনা করতেন।
৬. গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আসলে, আপত্তির উত্তর প্রদান কালে শ্রোতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কথা বলতেন।
৭. সকল বক্তব্যে প্রিয় নাবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শান-মান হৃদয়গ্রাহী অপূর্ব পদ্ধতিতে বর্ণনা করতেন।
৮. বাস্তবিক প্রযোজ্য বিষয় উল্লেখ করে উপদেশমূলক বক্তব্য প্রদান করতেন।
৯. যথাসম্ভব আক্বীদা বিষয়ের উপর জোর প্রদান করতেন এবং কুরআন-সুন্নাহ হতে উপমা পেশ করে বক্তব্য প্রদান করতেন।
১০. সমসাময়িক অবস্থা এবং ঘটনাবলীর উল্লেখ পূর্বক লোকজনদের বুঝাতেন, যাতে করে তারা বিষটি বুঝে বাস্তব জীবনের সাথে তা দ্রুত মিলাতে পারে।[২]

বইটি পড়ে পাঠক মহল খুবই উপকৃত হবেন মর্মে উল্লেখ করে সম্পাদক বলেন, "ওয়াজ মূলত আল্লাহর ফুয়ূজাত। হাকীমুল উম্মাতের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা, গুঢ় রহস্য উন্মোচন মূলক খোদা প্রদত্ত দৃষ্টি, সময়োপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন, উত্তরীয় মাসআলার দলীল উপস্থাপন, বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিউত্তর এবং আল্লাহর ওয়ালীগণের কারামাত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি পড়ে গড়পড়তা ছাত্ররা ভালোমানের ওয়ায়েজ এবং সাধারণ মুসলমানরা উঁচু পর্যায়ের গবেষক হতে পারবে"।[৩]

হাকীমুল উম্মাত কত বড়মাপের বক্তা-ওয়াইজ ছিলেন তা এই কিতাবটি পড়লে সহজেই অনুমান করা যাবে। তাঁর বক্তব্য কুরআন-সুন্নাহর নিক্তিতে অত্যন্ত উঁচু মানসম্পন্ন ছিল। এমন কিছু নুক্বতা (গুঢ় তথ্য) তিনি উল্লেখ করতেন যা খোদা প্রদত্ত জ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ। তাঁর বক্তব্য হাজার হাজার লা-মাযহাবী, বদ আক্বীদাধারীকে সুপথ দেখিয়েছে এবং ইসলামের গৌরব পতাকাকে সমুন্নত করেছে। আল্লাহপাক তাঁর এই খিদমাতের বিনিময় দান করুন। আমীন!

---

[১]- আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, মাওয়াইজ-ই নাঈমীয়্যাহ, নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; জুন-২০০৬ খ্রি., পৃ.নং-৪৪৫-৪৪৬।

[২]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩৬০।

[৩]- মুহাম্মদ আরিফ, হাফিয, মাওয়াইয-ই নঈমিয়্যাহ (ভূমিকা), নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; জুন-২০০৬ খ্রি.; পৃ.নং-০৩।

৪৪৬ পৃষ্ঠার বইটি হাফিজ মুহাম্মদ আরিফ-এর সম্পাদনায় নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান হতে প্রকাশ সন-তারিখ ব্যতিত প্রকাশিত হয়। এই ওয়াজ সম্ভার হতে নির্বাচিত ত্রিশটি ওয়াজ নিয়ে বঙ্গানুবাদ করে চট্টগ্রাম ফয়জুলবারী সিনিয়র (ফাযিল) মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন 'মাওয়ায়িজ-ই নঈমীয়্যাহ' শিরোনামে প্রথম খন্ড প্রকাশ ১৪২৯ হিজরী, জুলাই-২০০৮ ইংরেজী, শ্রবণ-১৪১৫ বাংলা সালে প্রকাশ করেন। প্রকাশনায়ঃ জান্নাত প্রকাশন, শাহমীরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।

মু'আল্লিম তাক্বরীর

(معلم تقریر)

আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (র.আ.) শেষ বয়সে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে ওয়াজ করেছেন তা হতে ১১টি ওয়াজ-এর সংকলন এই কিতাব। বইটির ভাষা অত্যন্ত উঁচু মানের। হাকীমুল উম্মাতের অন্যান্য ওয়াজ সম্ভার বা গ্রন্থের ভাষার তুলনায় এর ভাষা একটু কঠিনই মনে হয়েছে আমার। এ গ্রন্থে তিনি ফার্সী শব্দের ব্যবহার একটু বেশী করেছেন। সাধারণত বক্তা হিসেবে তিনি অত্যন্ত সহজভাষী ও উপমা নির্ভর স্পিকার ছিলেন। এই বইয়ের ওয়াজ সমূহেও যথেষ্ঠ পরিমাণ উপমা-ঘটনার অবতারণা তিনি করেছেন। 'মু'আল্লিম তাক্বরীর' নামীয় এই ওয়াজ সম্ভারের ১১ ওয়াজের বৈশিষ্ট্য হলো-

১. মুসলমানদের মৌলিক সফলতা কিসে তার বর্ণনা দিয়েছেন প্রথম ওয়াজে।
২. ধ্বংসের হাত থেকে মুসলমানদের পরিত্রাণের উপায় বর্ণনা করেছেন দ্বিতীয় তাক্বরীরে।
৩. আল্লাহকে ছেড়ে কাফিরগণ আসমান-জমিনে আশ্চার্যজনক বস্তুর কেন পূজা করে তার বর্ণনা দিয়েছেন তৃতীয় ওয়াজে। সাথে সাথে কুরআন মাজীদ কোন পন্থায় তার বিরোধ করেছে এবং সূফীগণ কোন দৃষ্টিতে তা দেখেছেন তার চমৎকার বর্ণনা এসেছে।
৪. চতুর্থ তাক্বরীরঃ ইসলামের সত্যতা, কুরআন এবং সাহিব-এ কুরআনের মর্যাদা ও সত্যতার বিষয়ে প্রদান করেছেন।
৫. পঞ্চম তাক্বরীরঃ যে কোন কাজ মুসলমানগণ পারস্পরিক পরামর্শ করে করার ফযীলত ও উপকারিতার কথা বিবৃত করেছেন।
৬. ষষ্ঠ ওয়াজঃ খোদাভীরুতা এবং সৎ ভালোবাসার বর্ণনা প্রদান করে তাকরীর উপস্থাপন করেছেন।
৭. সকল মুসলিম ভাই ভাই। বিশ্ব মুসলমান এক শরীর, এক জান। সপ্তম ওয়াজ এই বিষয়ে উপদেশ সহকারে বর্ণনা করেছেন।
৮. অষ্টম ওয়াজঃ আল্লাহপাক কর্তৃক মানুষকে কুরআন কীভাবে শিখানো হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন।
৯. নবম ওয়াজঃ তিন শ্রেণির ব্যক্তি তথা ডানপন্থী, বামপন্থী এবং পূর্ববর্তী নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দার বর্ণনা দিয়ে পেশ করেছেন।
১০. দশম তাক্বরীরঃ মি'রাজুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়ে প্রদান করেছেন।
১১. একাদশতম ওয়াজঃ আল্লাহপাক সর্বদ্রষ্টা এবং বান্দার সাথে তাঁর সার্বক্ষণিক থাকার বিষয়ে বিরোধীদের আপত্তি উল্লেখ পূর্বক তা খন্ডন করে তিনি 'সর্বদ্রষ্টা' এবং তিনি বান্দার 'সঙ্গে থাকা' বিষয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।[1]

বইটির প্রথম প্রকাশ অজানা। তবে বর্তমান বাজারে ফারুক্বীয়্যাহ বুক ডিপো, মেটিয়া মহল, জা'মে মসজিদ মার্কেট, দিল্লী-ভারত হতে মে-২০১০ সালে প্রকাশিত ১২৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কপিটি পাওয়া যায়। এটির বাংলা অনুবাদ এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে অনুবাদ চলমান রয়েছে। অনুবাদ করছেন বিশিষ্ট গবেষক মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন হেলাল, সিনিয়র আরবী প্রভাষক, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদরাসা, মোহাম্মদপুর-ঢাকা।

---

[1] - আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী, মু'আল্লিম তাক্বরীর, ফারুক্বীয়্যাহ বুক ডিপো, মেটিয়া মহল, জামে মসজিদ মার্কেট, দিল্লী, ভারত; মে-২০১০ খ্রি.; পৃ.নং-০১-১২৮।

আল-খুতাবাতুন নাঈমীয়্যাহ

(الخطبات النعيمية)

‘খুৎবাতে নাঈমীয়্যাহ’ বইটি হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.)-এর ওয়াজ এবং খুৎবাহ সংকলন। এখানে তিনি জুম‘আ, দুই ঈদ, বিবাহ এবং বিভিন্ন সভা-সমাবেশে আরবী ভাষায় যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা সংকলিত হয়েছে। ১১৪ পৃষ্ঠার বইটি তার ছোট সাহেবযাদা মুফতী ইক্তেদার আহমদ খান নঈমীর সংকলন, লিখন ও সজ্জায়নে নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান হতে ২৪ সফর-১৪০৪হিজরী/৩০ নভেম্বর-১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়। হাকীমুল উম্মাত এই খুৎবাগুলি কোথাও লিপিবদ্ধ করে যাননি বা তাঁর কোন ছাত্রও তাঁর জীবদ্দশায় শ্রুতি লিখনও লেখেননি। বরং তাঁর ছোট সাহিবযাদা নিজের স্মরণ ও তৎকালীন সময়ের হাকীমুল উম্মাতের ছাত্র-ভক্ত-অনুরক্তগণের স্মৃতিপট থেকে বা নোট থেকে তা শুনে লিখে নিয়ে গ্রন্থরূপ দিয়ে পিতার প্রতি সম্পর্কিত করে প্রকাশ করেছেন।[১] সংকলনটিতে ২০টি ওয়াজ ও খুৎবা স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে আরবী ভাষায় একটি ওয়াজের খুৎবাহ, একটি দরস প্রদানকালীন খুৎবাহ, জুম‘আ ও জুম‘আতুল বিদা‘আ সম্পর্কিত চারটি খুৎবাহ, দুই ঈদ সম্পর্কিত চারটি খুৎবাহ, ঈদ-এ মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বিবাহ এবং জানাযা সম্পর্কিত তিনটি খুৎবাহ মিলে সর্বমোট ১৩টি আরবী খুৎবা উল্লেখ করা হয়েছে। বইটির ৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশক কর্তৃক বলা হয়েছে– এই কিতাবের আরবী খুৎবাহসমূহ হাকীমুল উম্মাতের আর মাসাইল সংক্রান্ত যে আলোচনা তা সাহিবযাদা মুফতী ইক্তেদার আহমদ খান নঈমীর পক্ষ হতে লিখিত হয়েছে।[২]

আরবী খুৎবাহ সমূহ খুবই সমৃদ্ধ। ভাষা সরল কিন্তু ইবনু নাবাতার খুৎবার মত ছন্দবদ্ধ। দ্বিতীয় খুৎবাহ’র শব্দচয়ন আ‘লা হযরত আহমদ রেযা খান রেরেলভী (র.আ.)-এর খুৎবাতে রেযভীয়্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। খুৎবাহগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য-তত্ত্ব পূর্ণ। এগুলির সাথে মুফতী ইক্তেদার আহমদ খান নঈমী কর্তৃক উর্দূ ভাষায় বিষয় সংশ্লিষ্ট মাসআলার সংযোজন বইটির পাঠ গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে বলে আমি মনে করি। সর্বোপরি বইটি সাধারণ আলিম সমাজের জন্য খুবই উপকারী হবে বলে আশা রাখি।

এই সংকলনটির বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে আমার জানা নেই।

---

[১]- ইক্তেদার আহমদ খান নঈমী, মুফতী, আল-খুৎবাতুন নাঈমীয়্যাহ (ভূমিকা), নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান; ২৪ সফর-১৪০৪হিজরী/৩০ নভেম্বর-১৯৮২খ্রি., পৃ.নং-০২।

[২]- ঐ, পৃ.নং-৫০।

দীওয়ান-এ সালিক

(دیوان سالک)

‘দীওয়ান-এ সালিক’[1] আরবী, উর্দূ, ফার্সী ও হিন্দী ভাষায় রচিত ৪৪টি হামদ, না‘ত, মানক্বাবাত, প্রার্থনাগীতি, পরিতাপগীতি এবং সম্ভাষণমূলক কবিতা সংকলন। হাকীমুল উম্মাত বড় মাপের একজন কবি ছিলেন। কবিতা সৃষ্টিশীল মানষধারীর কাজ। সাধারণত কবিতা লেখা প্রায় শিক্ষিত লোকের দ্বারা সম্ভব। সাধারণ কবিতা যুগ যুগ ধরে প্রকৃতি-পরিবেশ, আবেগ-অনুরাগ-বিরাগ, প্রেম-মোহ-মায়া-ভালোবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, বিরহ-বিলাপ, অহম-অনুশোচনা-পরিতাপ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাসন-শোষন, প্রতিবাদ-আন্দোলন নানা বিষয়কে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে। মানব সভ্যতার রূপায়ণে কবি ও কবিতা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কবি ও কবিতা কালের মহান এক সাক্ষী। মানব মনন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ইসলামের দৃষ্টিতে কবিতা দু’ধরনের- একটি সত্য ও সুন্দরের পথপ্রদর্শক অপরটি মানব সভ্যতার জন্য ধ্বংসাত্মক, অকল্যাণকর, কুরুচিপূর্ণ বিভ্রান্ত চিন্তার ধারক। ইসলাম একদিকে যেমন কল্যাণকর সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছে ঠিক তেমনি সভ্যতার জন্য ক্ষতিকারক ও অশ্লীল সাহিত্য তৈরিতে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।[2] ইসলাম এসে তার লাগাম টেনে ধরেছে। সুকুমার বৃত্তিকে লালনকারী কবিতার অনুমোদ কুরআন-সুন্নাহ দিয়েছে। সাথে সাথে প্রবৃত্তি আশ্রিত-শরী‘আত বিরুদ্ধ কবিতার কঠোর ভাষায় নিন্দাও করেছে।[3] শরয়ী‘ বিষয়ে কবিতা লেখা সুদক্ষ আলিমের কাজ। অন্যথায় ঈমান হারা হওয়ার ভয় রয়েছে। ‘বিশেষত, না‘ত সাহিত্য রচনা করা খুবই কঠিন। অনেকেই এটাকে সহজ কাজ মনে করে। অথচ না‘ত রচনা মানে সুতীক্ষ্ণ তরবারির উপর চলার মত। সঠিকভাবে পা রাখলে সোজা তাওহীদ রাজ্যে প্রবেশ আর কোন প্রকার ত্রুটি হলে সমূহ বিপদ! উভয় দিক সংরক্ষিত’।[4] না‘ত শরীফ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অপরিসীম প্রেম-ভক্তি, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ছাড়া রচনা করা সম্ভবই না। হাকীমুল উম্মাত ‘দীওয়ান-এ সালিক’-এর কোন স্থানেই মুস্তফার দামান ছাড়েননি। আর এই কারণেই তাঁর না‘ত সাহিত্যে কবিত্বের পূর্ণতা, গভীর অনুরাগের সৌন্দর্যতাবোধ, ভাষার চয়ন ও বর্ণনার বয়ন পূর্ণ যৌবন নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে।[5]

কবিতা রচনা করার ক্ষেত্রে হাকীমুল উম্মাত সালিক বাদায়ূনী (র.আ.) যে বিষয়বস্তুসমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখেন তা হলো- নাবী ও সাহাবী প্রেম, মুসলিম জাতীয়তাবাদের চেতনাবোধ, দাওয়াতী চিন্তা-চেতনা, আল্লাহ-রাসূল এবং তাদের প্রিয়ভাজনদের শানকে উচ্চকিত করা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত-এর কার্যক্রমের সত্যায়ন করা এবং মন্দ সংস্কৃতির নিন্দা করা।[6]

---

[1]- এর ঐতিহাসিক মূল নাম ‘মুহামীদে পঁয়গাম্ভরী’। হাকীমুল উম্মাতের ছন্দাসিক নাম ‘সালিক বাদায়ূনী’ হতে সালিক নিয়ে সংকলক এর নাম দেন ‘দীওয়ানে সালিক’।

[2]- আলতাফ হোসেন, মুহাম্মদ হৃদয় খান, ইসলামের দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা এবং সাহিত্যচর্চা (কলাম) দৈনিক ইনকিলাব; শুক্রবার, ০৭ অক্টোবর-২০১৬, সংখা-১১৮।

[3]- পবিত্র কুরআনুল কারীমে কবিদের নামে ‘আশ-শু‘আরা’ নামক পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা রয়েছে। উক্ত সূরায় আল্লাহ বলেন, “কবিদের যারা অনুসরণ করে তারা বিভ্রান্ত। আপনি কি দেখেন না যে, তারা মাঠে মাঠে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এমন কথা বলে যা তারা করে না। তবে যারা ঈমান এনে, সৎকাজ করে এবং অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে সেই সব কবিদের কথা ভিন্ন। অত্যাচারীরা অচিরেই জানবে কোন স্থানে তারা ফিরে আসবে”। আল-কুরআন, সূরাঃ আশ-শু‘আরা, ২৬:২২৪-২২৭। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয়ই কোনো কোনো কবিতায় প্রজ্ঞা রয়েছে”। (সূত্রঃ বুখারী, আল-জামি’ আস-সাহীহ, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং-৫৭৯৩।) তিনি আরো বলেন, ‘কবিতা কথার মতোই (কথার সমষ্টি)। রুচিসম্মত কবিতা উত্তম কথাতুল্য এবং কুরুচিপূর্ণ কবিতা কুরুচিপূর্ণ কথাতুল্য’। (সূত্রঃ আহমদ ইবনু আলী, আবূ ইয়ালা (২১০হি./৮২৬খ্রি.-৩০৭হি./৯৪০খ্রি.), আল-মুসনাদ, দারুল মা’মুন লিত-তুরাস; ১৪১০হি./১৯৮৯খ্রি., খন্ড-০৮, পৃ.নং-২০০, হাদীছ নং-৪৭৬০; আলী ইবনু ওমার, আবুল হাসান দারুকুতনী, বাগাদাদী (৩০৬হি./৯১৮খ্রি.-৩৮৫হি./৯৯৫খ্রি.), আস-সুনান, দারুল মা‘রিফাত, বৈরুত- লেবনান; ১৪২২হি./২০০১খ্রি., খন্ড-০৪, পৃ.নং-১৫৫, হাদীছ নং-০১।)

[4]- মালফুজাত-এ আ‘লা হযরত, প্রাগুক্ত, খন্ড-০২, পৃ.নং-৪৬।

[5]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩৫৭, ৩৭১

[6]- আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-২১৫।

হকীমুল উম্মাত সর্বমোট ১১১টি না'ত রচনা করেছিলেন। গ্রন্থাবদ্ধ করার ইচ্ছে তাঁর ছিল না বিধায় এর বাকিটুকু হারিয়ে গেছে।[১] দীওয়ানে সালিক গ্রন্থে হাকীমুল উম্মাত আল্লাহপাকের গুণকীর্তন (হামদ) ০২টি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসাগীতি (না'ত) ১৭টি, আল্লাহর দরবারে প্রার্থনাগীতি (দো'য়া-মুনাজাত) ০৪টি, চার খুলাফা-এ রাশেদা (রা.)-এর শানে ০৪টি, উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-এর শানে ০১টি, রাসূল মাতা আমীনা বিনতে ওয়াহ্হাব (রা.)-এর শানে ০১টি, রাসূল কন্যা জান্নাত সর্দারিনী ফাতিমা (রা.)-এর শানে ০৪টি, ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শানে ০১টি, ইমাম জয়নুল আবেদীন আলী আওসাত ইবনে হুসাইন (রা.)-এর শানে ০১টি, ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা.)-এর শানে ০১টি, গাউছেপাক সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদির জিলানী (রা.)-এর শানে ০৩টি, স্বীয় ওস্তাদ ও পীর-মুর্শিদ আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রা.)-এর শানে ০৩টি, ০১টি দুই পংক্তির পরিতাপগীতি এবং বিবাহ সংক্রান্ত ০১টি সম্ভাষণগীতির মাধ্যমে এই সংকলনটি সমাপ্ত হয়।

কবিতাগুলোতে আল্লাহর ভালোবাসা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেম, আহলে বাইত, সাহাবা-তাবিঈগণের প্রতি মহব্বত, আউলিয়া-ওলামা-এর শান-মানই শুধু বর্ণিত হয়নি বরং সমকালীন মন্দ বিদ‘আত-অপসংস্কৃতি এবং সুন্নী মুসলমানদের অনগ্রসরতার কথাও অকপটে উঠে এসেছে। এর না‘ত এর মান সম্পর্কে ড. শাইখ বিলাল আহমদ সিদ্দিকী বলেন, “তাঁর না‘ত সাহিত্যে বিদ্যুতের চমক, মেঘের গর্জন, ফুলের সৌরভ, চন্দ্রের ঝলক এবং সাগরের তর্জন পাওয়া যায়” ।[২]

শাহযাদা মুফতী ইক্তেদার আহমদ খাঁন নঈমী বলেন, “হাকীমুল উম্মাত এই দীওয়ান শরীফে কবিতা শাস্ত্র ও ভাষাবিজ্ঞানের সকল নিয়ম প্রয়োগ করে প্রেমিকদের জন্য সুভাষিত মুক্তোমালা সাজিয়ে দিয়েছেন। বরং ঈমানের ফুলঝুড়ি তৈরি করে দিয়েছেন বলবো। কারণ, তাঁর কালাম হতে আল্লাহপ্রেম, রাসুলস্তুতি, আহলে বাইতের মহান শান, সাহাবা-তাবিঈগণের মান-মর্যাদা; বিশেষত, হুজুর গাউছে পাক (রা.) এবং তাঁর সম্মানিত শিক্ষক ও পীর সদরুল আফাযীল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.আ)-এর সাথে অপরিমেয় শ্রদ্ধা-ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে” ।[৩]

বইটি ভারতের কাছওয়াছা শরীফ ও দুরাজীতে হাকীমুল উম্মাতের শিক্ষকতাকালীন সময়ের স্মারক। এটি ১৩৫৭ হিজরীর দিকে লেখা হয়েছে। ৪৮ পৃষ্টার এই সংকলনটি নাঈমী কুতুব খানা, উর্দূবাজার লাহোর-পকিস্তান হতে সৈয়্যদ ফাদিল শাহ আনোয়ারে কলমদার-গুজরাট এর হস্তলিপিকৃত হয়ে ‘রাসায়িল-এ নাঈমীয়্যাহ’ গ্রন্থভূক্ত একটি পুস্তিকা। এটি আজও অনুবাদ হয়নি।

উপরিউক্ত বইগুলো ছাড়াও তিনি দরসে নেজামীর প্রায় সকল কিতাবের ব্যাখা, টীকা-টীপ্পনীও লিখেছিলেন। দুঃখের বিষয় তার অধিকাংশই দেশবিভাগ পরবর্তী হিজরত কালে হারিয়ে যায়। অবশিষ্ট যা অপ্রকাশিত ছিল তার কিছু অযত্নে-অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়।

---

[১]- বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ.নং-৩৭৫।

[২]- প্রাগুক্ত, ঐ।

[৩]- ইক্তেদার আহমদ খান নঈমী, মুফতী, তা‘রুফ-এ দীওয়ান-এ সালিক (রাসাইল-এ নাঈমীয়্যাহ), পৃ.নং-০১।

চ. মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) রচিত গ্রন্থাবলীর বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি বিন্যাস

যুগে যুগে ওলামা-মাশায়েখ বিভিন্নভাবে ইসলামের খিদমাত করেন। কেউ শুধু দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করে যোগ্য ছাত্র তৈরি করে ইসলামের খিদমাত করেন। কেউ শুধু ধর্মীয় বই-পুস্তক রচনা করে, কেউ আবার উভয় পন্থায় ধর্মের খিদমাত করেন। মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) অধ্যাপনা ও বই-পুস্তক রচনা উভয় দিক দিয়ে ধর্মের খিদমাত করেন। উভয় পন্থায় ইসলামের খিদমাত করলেও মুফতী সাহেবের মূল্যবান বই-পুস্তক রচনার পাল্লা ভারী বলেই আমার কাছে প্রতীয়মান।

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক শিরোনামে ও বৈচিত্রপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ের উপর অনেক মূল্যবান ইসলামী সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তাঁর রচনা ইসলামী সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষত উর্দূভাষী সাধারণ শিক্ষিত সমাজ তাঁর লেখনী দ্বারা বেশী উপকৃত হয়েছেন। সাহিত্যমান বিচারে তাঁর এই রচনাবলী বিদগ্ধ সমাজে প্রভূত প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই রচনাসমূহের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে অনেক বাংলাভাষী আলিম তাঁর অনেক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। কিছু গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। আরো কিছু প্রকাশের পথে রয়েছে। নিম্নে বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থ স্মরণী উপস্থাপন করা হলো-

ক্রমিক নং	বিষয়	বইয়ের নাম	ভাষা	প্রকাশ সাল
	বিষয়ঃ	**আক্বাঈদ**		
০১	০১	জা'আল হাক্ব ওয়া যাহাক্বাল বাতিল ফী ফায়সালা-এ মাসাইল	উর্দূ	১ম খন্ড প্রকাশ কাল- ১৩৬১ হিজরী, ১ম ও ২য় খন্ড একত্রে প্রকাশ কাল- ১৩৭৬ হিজরী। বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত।
০২	০২	জামীমা জা'আল হাক্ব ওয়া যাহাক্বাল বাতিল ফী ফায়সালা-এ মাসাইল	উর্দূ	১ম খন্ড প্রকাশ কাল-তারিখ বিহীন। বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত (মূল কিতাবের সাথে)।
০৩	০৩	শান-এ হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল কুরআন	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৬১ হিজরী। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত।
০৪	০৪	জামীমা শান-এ হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল কুরআন	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৬৫ হিজরী। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত (মূল কিতাবের সাথে)।
০৫	০৫	রহমত-এ খোদা ব-উসীলা-ই-আউলিয়া আল্লাহ্	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৭১ হিজরী। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত।
০৬	০৬	সালতানাত-এ মুস্তফা দর মামলাকাত-এ কিবরিয়া	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৬৭ হিজরী। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত।
০৭	০৭	হযরত আমীর-ই মু'য়াবিয়ার পর এক নজর	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৭৫ হিজরী। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত।
০৮	০৮	এক ইসলাম	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৭৫ হিজরী।
০৯	০৯	ইসলাম কী চার উসূলী ইস্তিলাহীঁ	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৮৪ হিজরী।
১০	১০	আল-কালামুল মাকবূল ফী ত্বাহারাতি নাসবির রাসূল	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৮৪ হিজরী।
১১	১১	ক্বহর-এ কিবরিয়া বর মুনকিরীন-এ ইসমত-এ আম্বীয়া		প্রকাশ কাল- ১৩৭৬ হিজরী। বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত।

ক্রমিক নং	বিষয়	বইয়ের নাম	ভাষা	প্রকাশকাল
১২	১২	রিসালা-এ নূর	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৭৫ হিজরী। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত।
১৩	১৩	হাশিয়া-এ মাদারিজুন নাবুওয়াত	উর্দূ	অপ্রকাশিত
	বিষয়ঃ	**আল-কুরআন ও উলূমুল কুরআন**		
১৪	০১	নূরুল ইরফান ফী হাশিয়াতিল কুরআন	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৭৭ হিজরী। বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত।
১৫	০২	আশরাফুত তাফাসীর যা তাফসীর-ই নাঈমী নামে প্রসিদ্ধ। এগারো পারা পর্যন্ত অসমাপ্ত তাফসীর	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৬৩ হিজরী। বাংলা অনুবাদ চলমান। প্রথম খন্ড প্রকাশিত।
১৬	০৩	ফায়দ্বান-এ সূরা নূর	উর্দূ	প্রকাশ কাল শাবান-১৪৩৪হি./জুন-২০১৩খ্রিষ্টাব্দ
১৭	০৪	ইলমুল কুরআন লি-তারজুমাতিল ফুরক্বান	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৭১ হিজরী। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত
১৮	০৫	দারসুল কুরআন	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৫৭ হিজরী।
১৯	০৬	আসরারুল আহকাম বি-আনওয়ারিল কুরআন	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৬৩ হিজরী। বাংলায় অনুবাদ প্রকাশিত।
	বিষয়ঃ	**হাদীছ ও উলূমুল হাদীছ**		
২০	০১	মিরআতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ (অনুবদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখাসহ)	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৭৮ হিজরী। বাংলায় অনুবাদ চলমান (পাঁচ খন্ড প্রকাশিত)
২১	০২	ইজমাল তারজুমা-এ ইকমাল (সাহাবা ও তাবিঈগণের জীবনী)	উর্দূ	প্রকাশিত। প্রকাশ সাল নেই।
২২	০৩	নাঈমুল বারী ফী ইনশিরাহ-ই বুখারী প্রকাশ নাঈমুল বারী (আরবী ভাষায় সর্ম্পূণ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)	আরবী	অপ্রকাশিত
	বিষয়ঃ	**আল-ফিক্বহ**		
২৩	০১	ইলমুল মিরাছ	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৫২ হিজরী।
২৪	০২	ইসলামী যিন্দেগী	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৬৩ হিজরী। বাংলায় অনুবাদ প্রকাশিত।
২৫	০৩	ফাতওয়া-ই নাঈমীয়্যাহ	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৫৭ হিজরী।
	বিষয়ঃ	**ওয়াজ-বক্তব্য**		
২৬	০১	খুৎবাত-এ নাঈমীয়্যাহ,	উর্দূ	প্রকাশিত-২৪ সফর-১৪০৪ হিজরী/৩০ নভেম্বর-১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ।
২৭	০২	মাওয়াইয-ই নাঈমীয়্যাহ ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড	উর্দূ	প্রকাশ কাল-তারিখ বিহীন। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত।
২৮	০৩	মু‘আল্লিম তাক্বরীর	উর্দূ	প্রকাশ কাল-মে-২০১০ খ্রি.।

ক্রমিক নং	**বিষয়**	**বইয়ের নাম**	**ভাষা**	**প্রকাশকাল**
	বিষয়:	**সফর নামা (ভ্রমণ কাহিনী ও হজ্ব ভ্রমণ)**		
২৯	০১	সফর নামা হজ্ব ওয়া যিয়ারাত	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৭৩ হিজরী।
৩০	০২	সফর নামা হিজাজ ও কিবলাতাঈন	উর্দূ	প্রকাশ কাল-১৩৭৫ হিজরী।
৩১	০৩	সফর নাম হজ্ব ওয়া যিয়ারাত	উর্দূ	প্রকাশিত (তারিখ বিহীন)। তিন খন্ড একত্রে ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়।
	বিষয়:	**কবিতা**		
৩২	০১	মুহামিদে পঁয়গাম্বরী (দীওয়ান-এ সালিক নামে পরিচিত)	উর্দূ-আরবী-ফার্সী-হিন্দী	প্রকাশ কাল-১৩৫৭ হিজরী।
	বিষয়:	**তর্ক-দর্শন-নাহু**		
৩৩	০১	হাশিয়া-এ সদরা (দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ)	আরবী	অপ্রকাশিত
৩৪	০২	হাশিয়া-এ হামদুল্লাহ (তর্কশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ)	আরবী	অপ্রকাশিত
৩৫	০৩	ইনজাহ-এ বুখারী (নাহুশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ)	উর্দূ	অপ্রকাশিত
৩৬	০৪	রিসালা-এ তাসাউ্উফ (সূফীতাত্ত্বিক গ্রন্থ)	উর্দূ	অপ্রকাশিত

চ. উপসংহার:

শাইখুত তাফ্‌সীর ও শাইখুল হাদীছ হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.) একজন বহু প্রতিভাধর লেখক এবং সংস্কারক আলিম ছিলেন। তিনি তাঁর অলংকারিক লেখনির মাধ্যমে জ্ঞানপিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করে প্রশান্তি দান করেছেন। তাঁর লেখনি ক্ষমতাকে তিনি ইসলামের মৌলিকত্ব, মহানত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষায় ব্যয় করেছেন। তাঁর কলম প্রজ্ঞা-মেধা, চিন্তা-গবেষণা, শৃঙ্খলা-সংগঠন, সুস্থিরতা-সুদৃঢ়তা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, আক্বীদা-আমল, ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান করে থাকে। 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার পর ইসলামের মূলধারা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর ভাষ্যকার হিসেবে 'হাকীমুল উম্মাত' উপাধী প্রাপ্ত, সর্বমহলে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ.)-এর নাম ও কর্ম জ্ঞান জগত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করে থাকে'। তিনি দ্বীনের খিদমাত ও জাতির সংশোধনের নিমিত্তে যে জ্ঞান বাতি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তা থেকে অসংখ্য লোক প্রভা হাসিল করেছে। তিনি ছিলেন বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী। বিশেষ করে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছে বিশেষ মর্যাদার আসনে। লেখক হিসেবে তিনি অত্যন্ত উঁচু মাপের লেখক ছিলেন। তার গ্রন্থরাজি জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভরপুর। গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি কুরআন-সুন্নাহ ছাড়াও নানামুখী দলীলের সাহায্য নিয়ে প্রত্যেকটা রচনাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত-অলংকৃত করেছেন। জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি মাত্রই তাঁর গ্রন্থ অধ্যয়নে বিমোহিত হয়ে পড়ে। ভাষার সরলতা, যৌক্তিক উপস্থাপনা, দালীলিক সুষমতা এবং বর্ণনার ঢং ইসলামী সাহিত্যাকাশে তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে।

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রচিত বই এর সংখ্যা অনুসন্ধান করতে গিয়ে ৩৬টি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ০৬টি বই অপ্রকাশিত। এসব বইয়ের কোন কোনটি মৌলিক; কতগুলো অনুবাদমূলক; কোন কোনটি ব্যাখ্যামূলক; কোনটি আবার বিতর্কমূলক; কোনটি পিউর ইসলামী সাহিত্য এবং কোনটি সহায়ক ইসলামী সাহিত্য। সাহিত্যিক মান বিচারে সমাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনে এগুলো রচিত। এসব বই উর্দূ-আরবী ভাষায় গ্রন্থিত। বাংলাভাষী আলিমগণ প্রয়োজনের তাগীদে এগুলোর প্রায় সবকটির অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। কিছু প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। কয়েকটি বই ইংরেজি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। এগুলোর তেরটি আক্বাঈদ বিষয়ে লেখা। তন্মধ্যে 'জা'আল হাক্ব' এবং 'শান-এ হাবীবুর রহমান' অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে।

আল-কুরআন বিষয়ে সাহিত্যের সংখ্যা ছয়টি। এর মধ্যে 'নূরুল ইরফান' ও 'তাফসীর-ই নাঈমী' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া 'ইলমুল কুরআন' বইটি মৌলিকত্বের দাবী রাখে।

হাদীছ সাহিত্যের সংখ্যা তিনটি। 'মিরআতুল মানাজীহ' বইটি সর্বস্তরের পাঠকের জন্য বিশেষ ফলদায়ক। মাযহাব বিরোধীদের মুকাবিলায় এবং ফিক্বহী মাসআলা জানার ক্ষেত্রে বইটি আলিম ও গবেষক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত।

ফিক্বাহ বিষয়ে গ্রন্থের সংখ্য তিনটি। তন্মধ্যে 'ফাতওয়া-এ নাঈমীয়্যাহ' বইটি হানাফী ফিক্বহের আকর। ফলে বইটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে।

ওয়াজ-নসীহত বিষয়ক গ্রন্থও তিনটি। 'মু'আল্লিম তাক্বরীর' বইটির আলোচনা পাঠকের মর্মে প্রভাব ফেলে যাবে নিশ্চয়ই।

সফর নামা সাহিত্য তিনটি। বর্তমানে এগুলি একত্রে প্রকাশিত পাওয়া যায়। মধ্যপ্রাচ্য যা ইসলামের উর্ভর ভূমি তার ভ্রমণ ভাষাচিত্র অংকিত হয়েছে এই তিন গ্রন্থে। পাঠক একবার শুরু করলে শেষ না করে উঠতেই মন চাইবে না। বিশেষত, 'সফর নামা হিজাজ ও কিবলাতাঈন' বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এসব সাহিত্য রচনার মাধ্যমে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবা-ওয়ালী-ওলামদের প্রকৃত শান-মানকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে সত্যিকারের নাবী ওয়ারীছের পরিচয় দিয়েছেন এবং নিমক হালাল উম্মতের হক্ব আদায় করেছেন। এত বড় মাপের আলিম হওয়া সত্বেও সাধারণ জীবনাচার তাঁকে মানুষের হৃদয়ের কাছে নিয়ে গেছে। ফলে, সাধারণের চাহিদা বুঝে তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। একজন আদর্শ সন্তান, ছাত্র, শিক্ষক, স্বামী, পিতা-অভিভাবক, বক্তা, তার্কিক, খানেক্বার পীর, ময়দানের মুজাহিদ, সহযাত্রী, সহমর্মী বন্ধু এবং সুবিজ্ঞ লেখক যে চরিত্র দিয়েই তাঁকে বিবেচনা করা হউক না কেন; তিনি সর্বক্ষেত্রে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের মূর্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহপাক এই মহান ব্যক্তিকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মক্বাম দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁর রচিত ইসলামী সাহিত্যের যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক তার উপর আমল করার তাওফীক্ব নসীব করুন। আমীন! বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ছ. গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

প্রকাশিত যে সকল গ্রন্থ হতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে

(লেখকের মৃত্যু সন অনুযায়ী গ্রন্থপঞ্জী সাজানো হয়েছে)

আল-কুরআন ও তাফসীর:

মুহাম্মদ ইবনু ওমার আর-রাযী, ফখরুদ্দীন, আবূ আব্দিল্লাহ (৫৪৪হি./১১৫০খ্রি.-৬০৬হি./১২০৯খ্রি.): তাফসীর মাফাতীহুল গাইব, দারুল ফিকর, বৈরুত- লেবানন; ১৪০১হি./১৯৮১খ্রি.।

মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আল-কুরতুবী, আবূ আব্দিল্লাহ (১২১৪খ্রি.-১২৭৩খ্রি./৬৭১হি.): আল-জা'মিউ লি-আহকামিল কুরআন ওয়াল মুবিনু লিমা তাদ্বাম্মানা মিনাস সুন্নাতি ওয়া আহকামিল ফুরক্বান, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, কায়রো-মিশর; ১৩৩৪হি.-১৯৬৪খ্রি.।

ইসমাঈল হাক্বী, (১০৬৩হি./১৬৫৩খ্রি.-১১২৭হি./১৭২৫খ্রি.): রুহুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল ফিকর, বৈরুত-লেবানন; ১৪ নভেম্বর-২০১০খ্রি.।

আব্দুল আযীয দেহলভী, শাহ (১১৫৭হি./১৭৪৬খ্রি.-১২৩৯হি./১৮২৪খ্রি.), তাফসীর আযীযী (উর্দূ-জাওয়াহির-এ আযীযী, অনুবাদ: মাহফুযুল হক ক্বাদিরী, সৈয়্যদ): নূরীয়্যাহ আযীযীয়্যাহ পাবলিকেশন, দাতা গঞ্জবখশ রোড, লাহোর-পাকিস্তান; জুমাদাল উলা-১৪২৯হি./জুন-২০০৮খ্রি.।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): নূরুল ইরফান ফী হাশিয়াতিল কুরআন (উর্দূ), তারিখ বিহীন।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): আশরাফুত তাফাসীর (তাফসীর নাঈমী), মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, গুজরাট-পাকিস্তান; ১৩৬৩ হিজরী।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): ইলমুল কুরআন, মাকতাবাতুল মাদীনা, করাচী-পাকিস্তান; ২০০৭ খ্রি.।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.) (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): দারসুল কুরআন, নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; তারিখ বিহীন।

ইক্তেদার আহমদ খান নঈমী, মুফতী: তাফসীর নাঈমী (উর্দূ), নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান; জানুয়ারি-২০০৫খ্রি.।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): ফায়দ্বান-এ সুরা নূর, মাকতাবাতুল মাদীনা, করাচী-পাকিস্তান; শাবান-১৪৩৪হি./জুন-২০১৩খ্রি.।

মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, মাওলানা (অনুবাদক, জন্ম: ৩ মার্চ ১৯৬০): কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান (বঙ্গানুবাদ): ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমি, চট্টগ্রাম-বাংলাদেশ; ২০০৪খ্রি.।

মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, ড. (অনুবাদক): আশরাফুত তাফাসীর তাফসীর নাঈ'মী (বাংলা), আলকুর'আন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা-বাংলাদেশ; ২০১৭খ্রি.।

মজীদ উল্লাহ ক্বাদিরী, ড. (প্রফেসর-করাচী ইউনিভার্সিটি): ভূমিকা-তাফসীর নাঈ'মী (বাংলা), আলকুর'আন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা-বাংলাদেশ; প্রকাশকাল-২০১৭খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): আসরারুল আহকাম বি-আনওয়ারিল কুরআন, নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; জুন-২০০৬ খ্রি.।

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজামী, মাওলানা: শরয়ী বিধানের গুঢ় রহস্য (আসরারুল আহকাম এর অনুবাদ), আল-মদিনা প্রকাশনী, আন্দরকিল্লা-চট্টগ্রাম; ১২ রমযান- ১৪৩৩ হিজরী/১৭ শ্রাবণ-১৪১৯ বঙ্গাব্দ/০১ আগস্ট-২০১২খ্রি.।

মুহাম্মদ জি.এ হক, প্রফেসর: নূরুল ইরফান আ'লা কানযুল ঈমান (ইংরেজি ভাষায় অনূদিত): তৈয়্যব গ্রুফ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, ফয়সালাবাদ-পাকিস্তান; শুক্রবার, ৩ মে-২০০৩ খ্রি.।

আল-হাদীছ ও শারহুল হাদীছ:

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবী শাইবা, আবূ বকর (১৫৯হি./৭৭৬খ্রি.-২৩৫হি./৮৫০খ্রি.): আল-মুসান্নাফ, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ-সৌদি আরব; ১ম প্রকাশ, ১৪০৯হি.।

আহমদ ইবনু হাম্বল আশ-শায়বানী, আবূ আব্দিল্লাহ (১৬৪হি./৭৮০খ্রি.-২৪১হি./৮৫৫খ্রি.): আস-সুনানুল কুবরাহ, মুআস্‌সাতুন কুরতুবা, কায়রো-মিশর; তারিখ বিহীন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আদ-দারিমী (১৮১হি./৭৯৭খ্রি.-২৫৫হি./৮৬৪খ্রি.): আস-সুনান, দারুন নাশআতিল ইসলামীয়্যাহ, বৈরুত-লেবানন; ০২ জুন-২০১৪খ্রি.।

মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, আবূ আব্দিল্লাহ (১৯৪হি./৮১০খ্রি.-২৫৬হি./৮৭০খ্রি.): আল-জা'মি আস-সাহীহ, দারু তাওকিন নাজাত, আল-মাকতাবাতুশ শামিলা; ১ম প্রকাশ ১৪২২হি.।

মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু মাযাহ আল-কাযভিনী, আবূ আব্দিল্লাহ (২০৯হি./৮২৪খ্রি.-২৭৩হি./৮৮৬খ্রি.): আস-সুনান, দারুল ফিকর, বৈরুত-লেবানন; তারিখ বিহীন।

মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, আবূ ঈসা (২০৯হি./৮২৪খ্রি.-২৭৯হি./৮৯২খ্রি.): আল-জা'মী আস-সুনান, দারু এহয়াইত তুরাছিল আরাবী; বৈরুত-লেবানন; তারিখ বিহীন।

আহমদ ইবনু আলী আত-তামিমী, আবূ ইয়ালা (২১০হি./৮২৬খ্রি.-৩০৭হি./৯৪০খ্রি.): আল-মুসনাদ, দারুল মা'মুন লিত-তুরাছ, বৈরুত-লেবানন; ১৪১০হি./১৯৮৯খ্রি.।

আহমদ ইবনু মুহাম্মদ বিন সালামাহ আত-তাহাভী, আবূ জাফর (২২৮হি./৮৫২খ্রি.-৩২১হি./৯৩৩খ্রি.): মুশকিলুল আসার, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-লেবানন; ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯হি.।

সুলাইমান ইবনু আহমদ আত-তাবরানী, আবুল ক্বাসিম (২৬০হি./৮২১খ্রি.-৩৬০হি./৯১৮খ্রি.): আল-মু'জাম আল-কাবীর, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মৌসুল-ইরাক; ২য় প্রকাশ, ১৪০৪হি./১৯৮৩খ্রি.।

আলী ইবনু ওমার দারুকুতনী, আবুল হাসান বাগদাদী (৩০৬হি./৯১৮খ্রি.-৩৮৫হি./৯৯৫খ্রি.): আস-সুনান, দারুল মা'রিফাত, বৈরুত-লেবনান; ১৪২২হি./২০০১খ্রি.।

মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল্লাহ হাকীম আন-নিশাপুরী, আবূ আব্দিল্লাহ (৩৪১হি./৯৩৩খ্রি.-৪০৫হি./১০১২খ্রি.): আল-মুসতাদরাক আলাস-সাহীহাইন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-লেবানন; ১ম প্রকাশ, ১৪১১হি./১৯৯০খ্রি.।

আহমদ ইবনু হুসাইন আল-বায়হাক্বী, আবূ বকর (৩৮৪হি./৯৯৪খ্রি.-৪৫৮হি./১০৬৬খ্রি.): শু'আবুল ঈমান, মাজলিসু দাইরাতুল মা'আরিফ, হয়দারাবাদ-ভারত; ১ম প্রকাশ-১৩৪৪হি.।

মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল্লাহ খতীব তিবরিযী, ওয়ালী উদ্দীন (ওফাত-৭৪১হি./১৩৪০খ্রি.): মিশকাতুল মাসাবীহ, মাকতাবাহ আল-ফাতাহ, বাংলাবাজার, ঢাকা; তারিখ বিহীন।

আহমদ ইবনু আলী ইবনু হাযর, শিহাবুদ্দীন আল-আসক্বালানী (৭৭৩হি./১৩৭১খ্রি.-৮৫২হি./১৪৪৯খ্রি.), ফাতহুল বারী ফী শারহি সাহীহিল বুখারী, আল-মাত্ববা'আস সালাফীয়্যাহ ওয়া মাকতাবাহা, কায়রো-মিসর; ২০১৫খ্রি.।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): ইজমাল তারজুমা-ই ইকমাল, আলা হযরত নেটওয়ার্ক, তারিখ বিহীন।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): মিরআতুল মানাজীহ শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ, নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান; তারিখ বিহীন।

মুস্তফা রেযা খান বেরেলভী, মুফতী-এ আজম (১৪১০হি./১৮৯২খ্রি.-১৪০২হি./১৯৮১খ্রি.): মালফুজাত-এ আ'লা হযরত, জা'মেয়া নেজামিয়া রিজভীয়্যাহ, শেখুপুর, পাঞ্জাব-পাকিস্তান; জুলাই-১৯৯৫ খ্রি./১৪১৫হি.।

শরীফুল হক্ব আমজাদী, মুফতী মুহাম্মদ (১৩৪০হি./১৯২১খ্রি.-১৪২১হি./২০০০খ্রি.): নুযহাতুল ক্বারী শারহি সাহিহীল বুখারী, ফরীদ বুক স্টল, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; ২য় প্রকাশ-১৪২৮হি.।

আব্দুল মান্নান, মুহাম্মদ, মাওলানা (অনুবাদক): মিরআতুল মানাজীহ শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ, ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম-বাংলাদেশ; ১২ রবিউল আউয়াল-১৪৩০হি./২৬ফাল্গুন-১৪১৫বঙ্গাব্দ/ ১০মার্চ-২০০৯খ্রি.।

আল-ফিক্বহ:

আব্দুল ক্বাদির আল-জিলানী, শাইখ সৈয়্যদ (৪৭০হি./১০৭৮খ্রি.-৫৬১হি./১১৬৬খ্রি.): গুণিয়াতুত্ ত্বালেবীন (অনুবাদকঃ এ. এন. এম. ইমদাদুল্লাহ), বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-বাংলাদেশ; ২য় প্রকাশ-১৯৯৬ ইং।

মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ আল-হানাফী, সিরাজুদ্দীন আবু তাহির আস-সাজাওয়ান্দী (ওফাত-৬০০হি.-১২০৪খ্রি.), কিতাবুল ফরায়িজ (সিরাজী), এমদাদীয়া লাইব্রেরি, চকবাজার-ঢাকা, বাংলাদেশ; তারিখ বিহীন।

আহমদ রেযা খান বেরেলভী, আ'লা হযরত (১২৭২হি./১৮৫৬খ্রি.-১৩৪০হি./১৯২১খ্রি.): আল-আত্বাইয়ান নাবাভীয়্যাহ ফিল ফাতাওয়া আর-রেজভীয়্যাহ, মাকতাবাতুল মাদীনা, করাচী-পাকিস্তান; ২য় প্রকাশ, ১৪৩৪হি./২০১৩খ্রি.।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): ইসলামী যিন্দেগী, মজলিস আল-মদীনাতিল ইলমিয়্যাহ, দাওয়াত-এ ইসলামী, করাচী-পাকিস্তান; রমযানুল মুবারক-১৪৩১হি./সেপ্টেম্বর-২০১০খ্রি.।

মুহাম্মদ ওয়াক্বার উদ্দীন, মুফতী-এ আজম পাকিস্তান (১৩৩৩হি./১৯১৫খ্রি.-১৪১০হি./১৯৮৯খ্রি.): ওয়াক্বারুল ফাতওয়া, বজমে ওয়াক্বারুদ্দীন, করাচী-পকিস্তান; সফর-১৪২১ হি./মে-২০০০ সাল।

জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আমজাদী, ফক্বীহ-এ মিল্লাত (১৩৫২হি./১৯৩৩খ্রি.-১৪২২হি./২০০১খ্রি.): ফাতওয়া আমজাদীয়া, শব্বীর ব্রাদার্স, লাহোর-পকিস্তান; ২০০৫খ্রিঃ।

জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আমজাদী, ফক্বীহ-এ মিল্লাত (১৩৫২হি./১৯৩৩খ্রি.-১৪২২হি./২০০১খ্রি.): ইলম ও আলিমের মর্যাদা (ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ মুহসিন, মাওলানা), সান্জরী পাবলিকেশন, ঢাকা-১২০৫; ১০ অক্টোবর-২০১১, ১১ জিলক্বদ-১৪৩২হি./২৫ আশ্বিন-১৪১৮বঙ্গাব্দ।

সম্পাদনা পরিষদঃ ফাতওয়া ও মাসাইল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ, ডিসেম্বর-২০০৯খ্রি.।

মুহাম্মদ শুয়াইব ক্বাদিরী, মাওলানাঃ ওয়াক্বারুল ফাতাওয়া (উর্দূ) ভূমিকা, বজমে ওয়াক্বারুদ্দীন, করাচী-পকিস্তান; সফর-১৪২১ হি./মে-২০০০ সাল।

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (জন্ম-১৯৮৮খ্রি.): সফরের ইসলামী বিধান, মেহবার পাবলিকেশন, ঢাকা-১০০০; প্রথম প্রকাশ- শাবান-১৪৩৮হি./ মে-২০১৭খ্রি.।

মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী, মুহাম্মদঃ দান-সদকার ফজিলত ও এগার সংখ্যার বরকত, তৈয়্যেবিয়া রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার, মিরপুর-১, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ ১৪ শাবান-১৪৩৬ হি./১৯ জৈষ্ঠ্য-১৪২২ বঙ্গাব্দ, ০২ জুন-২০১৫।

আল-আক্বাঈদ:

আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আল-মাক্বদাসী, ইবনু কুদামা (৫৪১হি.-৬২০হি.): লুম‘আতুল ই‘তিক্বাদ আল-হাদী ইলা সাবিলির রাশাদ, মাকতাবাহ আদ্বওয়াউস সালাফ, রিয়াদ-সৌদি আরব; তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৫হি./১৯৯৫খ্রি.।

আহমদ ইবনু তাইমিয়া, শাইখুল ইসলাম (৬৬১হি./১২৬৩খ্রি.-৭২৮হি./১৩২৮খ্রি.): ক্বাইদাতুল জালীলাহ ফীত-তাওয়াস্সুলি ওয়াল ওয়াসীলা, ইদারাতুল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, রিয়াদ-সৌদি আরব; ১৪২০হি./১৯৯৯খ্রি.।

আলী বিন সুলতান আল-হানাফী, মুল্লা আল-ক্বারী (ওফাত-১০১৪হি./১৬০৬খ্রি.): শারহুল ফিক্বহিল আকবার, দারুল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা, মিসর; তারিখ বিহীন।

মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আল-হামদ, শাইখ (১৩১১হি./১৮৯৩খ্রি.-১৩৮৯হি./১৯৬৯খ্রি.): মুখতাসার আক্বীদাতু আহলিস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতঃ আল-মাফহুম ওয়াল খাসাইস, ওয়াযারাতুল আওক্বাফ ওয়াশ শুয়ূনী, রিয়াদ-সৌদি আরব; ২৬ অক্টোবর-২০১৩খ্রি.।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): জা-আল হাক্ব ওয়া যাহাক্বাল বাতিল ফী ফায়সালায়-এ মাসাইল, নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান; ১৪০৩ হি.।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): রহমতে খোদা ব-উসিলা-এ আউলিয়া আল্লাহ, আ‘লা হযরত নেটওয়ার্ক, তারিখ বিহীন।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): শান-এ হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল কুরআন, মাকতাবাহ ইসলামীয়্যাহ, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; তারিখ বিহীন।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): ক্বহর-এ কিবরিয়া বর মুনকিরীন-এ ইসমত-এ আম্বীয়া, ইসলামিক এডুকেশান ডটকম, তারিখ বিহীন।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): রিসালা-এ নূর, নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; তারিখ বিহীন।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): সালতানাত-এ মুস্তফা দর মামলাকাত-এ কিবরিয়া, নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; তারিখ বিহীন।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): আল-কালামুল মাক্ববূল ফী ত্বাহারাতি নাসবির রাসূল, মাকতাবাহ আনোয়ার-এ মাদীনা, হায়দারাবাদ-ভারত; তারিখ বিহীন।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): শরীয়তের দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু (অনুবাদক: অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান), মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম; ০১ জুলাই-১৯৯৬খ্রি.।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): এক ইসলাম, আ‘লা হযরত নেটওয়ার্ক, তারিখ বিহীন।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): ইসলাম কী চার উসূলী ইস্তিলাহীঁ, আ‘লা হযরত নেটওয়ার্ক, তারিখ বিহীন।

আবুল আ‘লা মওদুদী, সৈয়দ (১৯০৩খ্রি.-১৯৭৯খ্রি.): কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তিলাহীঁ, ইসলামী পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, এম শাহ আলম মার্কেট, লাহোর-পাকিস্তান; প্রথম প্রকাশ- ১৯ অক্টোবর-১৯৭৩।

মুহাম্মদ শরফ আল-কাদেরী, আল্লামা, মুফতি (১৯৪৪খ্রি.-২০০৭খ্রি.): ইসলামী শরীয়তে উছিলা (অনুবাদ: জসিম উদ্দীন আল-আযহারী, মাওলানা, মুহাম্মদ), অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৫ শা’বান-১৪৩৬ হিজরী/২০ জ্যৈষ্ঠ-১৪২২ বঙ্গাব্দ/৩ জুন-২০১৫ ইংরেজি।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খোন্দকার, ড. (১৯৬১খ্রি.-২০১৬খ্রি.): কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ-বাংলাদেশ; যুলহাজ্জা-১৪২৮হি.,ডিসেম্বর-২০০৭ ঈসায়ী।

আহমদ আলী, ড.: ইসমাতুল আম্বিয়া, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; জুলাই-২০১১/আষাঢ়-১৪১৮/রজব-১৪৩২।

হেমায়েত উদ্দিন, মাওলানা মুহাঃ (জন্ম-১৯৬০খ্রি.): ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, থানভী লাইব্রেরি, বাংলাবাজার, ঢাকা-বাংলাদেশ; চতুর্থ প্রকাশ-২০০৭ ঈসায়ী।

সাঈদুল্লাহ খান ক্বাদিরী, মুফতী: সা‘ইদুল হাক্ব ফী তাখরীয-এ জা‘আল হাক্ব, মাকতাবা-এ গাউছিয়া, করাচী-পাকিস্তান; ১৪৩১হি./২০১০খ্রি.।

ইতিহাস ও জীবনী:

আব্দুল মালিক ইবনু হিশাম, আবূ মুহাম্মদ, (ওফাত-২১৮হি./৮৩৩খ্রি.): আস-সিরাতুন নাবাভীয়্যাহ, দারু ইবনি হাযম, বৈরুত-লেবানন; দ্বিতীয় প্রকাশ-১৪৩০হি./২০০৯খ্রি.।

মুহাম্মদ ইবনু জারীর আত-তিবিরিস্থানী, আবু জাফর আত-তাবারী (২৪৪হি./৮৩৯খ্রি.-৩১০হি./৯২৩খ্রি.): তারীখুর রাসূল ওয়াল মূলুক (তারীখ-এ তাবারী), দারুল মা‘আরিফ, মিসর; দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৬৮খ্রি.।

ইয়াকূত ইবনু আব্দিল্লাহ আল-হামাভী, শিহাবুদ্দীন (৫৭৪হি./১১৭৮খ্রি.-৬২৬হি./১২২৫খ্রি.): মু‘জামুল বুলদান, দারুস সাদির, বৈরুত-লেবানন; ১৩৯৭হি./১৯৯৩খ্রি.।

আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু খল্লিক্বান (৬০৮হি./১২১১খ্রি.-৬৮১হি./১২৮২খ্রি.): ওয়াফিআতুল আ‘ইয়ান ওয়া আন্বাউ আবনায়িয যামান, দারুস সাদির, বৈরুত-লেবানন; ২৭ নভেম্বর-২০১১খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আয-যাহাবী, হাফিয শামসুদ্দীন (৬৭৩হি./১২৭৪খ্রি.-৭৪৮হি./১৩৪৮খ্রি.): সিয়ারু আ'লামীন নুবালা, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, কায়রো-মিসর; ১৪০২হি./১৯৮২খ্রি.।

ইসমাঈল ইবনু ওমার আদ-দিমাশক্বী, আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর (৭০১হি./১৩০১খ্রি.-৭৭৪হি./১৩৭৩খ্রি.): আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, বৈরুত-লেবানন; ১৪১০হি./১৯৯০খ্রি.।

সুলাইমান নদভী, সৈয়্যদ (১৮৮৪খ্রি.-১৯৫৩খ্রি.): হায়াত-এ শিবলী-তাযকিরাহ ওয়া সাওয়ানিহ, মাতবাহ মা'আরিফ, আজমগড়-ভারত; প্রথম প্রকাশ-১৯৪৭খ্রি.।

বিচারপতি আব্দুল মওদুদ (১৯০১খ্রি.-১৯৭০খ্রি.): ওহাবী আন্দোলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, জিন্দাবাজার-ঢাকা; ১৬ সেপ্টেম্বর-১৯৬৯খ্রি.।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): সফর নামা, নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; জুন-২০০৬ খ্রি.।

মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, ড.(জন্ম-১৯৫৩খ্রি.): বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দূতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০১-১৯৭১), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ-১৪১২, এপ্রিল-২০০৫, রবিউল আউয়াল-১৪২৬; ISBN : 984-06-1014-7.

হানীফ গাঙ্গোহী, মুহাম্মদ, মাওলানা: জুফরুল মুহাস্‌সিলীন বি-আহওয়ালিল মুসান্নিফীন, দারুল ইশা'আত, করাচী-পাকিস্তান; মার্চ-২০০০খ্রি.।

নজীর আহমদ নঈমী, মৌলভীঃ সাওয়ানিহ-এ ওমারী, নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান; ২০০৪খ্রি.।

আব্দুল হামীদ নঈমী, মুফতীঃ হায়াত-এ হাকীমুল উম্মাত, নাঈমী কুতুবখানা, লাহোর-পাকিস্তান; ২০১১খ্রি.।

আব্দুন্নাবী কাওকাব, কাজী (১৯৩৬-১৯৭৮খ্রি.): হায়াত-এ সালিক, নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান; ২০০৪খ্রি.।

বিলাল আহমদ সিদ্দিকী, শাইখঃ হালাত-এ জিন্দেগী, নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট-পাকিস্তান; ২০০৪খ্রি.।

আব্দুল হাকীম শরফ ক্বাদিরী, মুহাম্মদ (১৯৪৪খ্রি.-২০০৭খ্রি.): তাযকিরাহ আকাবীর-এ আহলে সুন্নাত, মাকতাবাহ ক্বাদিরীয়্যাহ, লাহোর-পাকিস্তান; প্রথম প্রকাশ-১৯৭৬খ্রি.।

মাজলিস আল-মাদীনাতুল ইলমিয়্যাহ সম্পাদিতঃ ফয়জান-এ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী , আল-মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ, করাচী-পাকিস্তান; তারিখ বিহীন।

মালিক রাম (১৩২৪হি./১৯০৬খ্রি.-১৪১৩হি./১৯৯৩খ্রি.): তাযকিরাহ মাহ ও সাল, মাকতাবাহ জা'মেয়া লিমিটেড, নতুন দিল্লি, ভারত; ১৯৯১খ্রি.।

মুহাম্মদ আসলাম, প্রফেসর (১৯৩২খ্রি.-১৯৯৮খ্রি.): ওয়াফীয়াত মাশাহীর-এ পাকিস্তান, মুক্তাদারা ক্বাওমী যবান, ইসলামাবাদ-পাকিস্তান; সেপ্টেম্বর-১৯৯৯খ্রি.।

সত্যসাধন চক্রবর্তী, অধ্যাপক (১৯৩৩খ্রি.-২০১৮খ্রি.) ও নির্মল কান্তি ঘোষ, অধ্যাপকঃ ভারতের শাসন ব্যবস্থার ভূমিকা, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, গান্ধী রোড, কোলকাতা-ভারত; পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর-১৯৯৫খ্রি.।

সফিউর রহমান আল-মুবারকপুরী, শাইখ (১৯৪৩খ্রি.-২০০৬খ্রি.): আর-রাহীকুল মাখতুম, দারুল ওয়াফা, মিশর; একবিংশ সংস্করণ-১৪৩১হি./২০১০খ্রি.।

সাহা, দিলিপ কুমার: দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস [১৮৫৭-১৯৪৭], ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরি, বাংলাবাজার-ঢাকা; তৃতীয় প্রকাশ-২০১৭খ্রি.।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম, মাওলানা (১৯১৮খ্রি.-১৯৮৭খ্রি.): শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, খায়রুন প্রকাশনী, বাংলাবাজার-ঢাকা; ৫ম প্রকাশ: মে-২০১১ ইং, পৃ.নং-২৭৫।

তারা চাঁদ, ডক্টর: ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব (এস. মুজিব উল্লাহ্ অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা; তৃতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর-২০০৭/ ভাদ্র-১৪১৪/শাবান-১৪২৮. ISBN: 984-06-0011-7.

দেলোয়ার হোসেন, আবূ মোঃ ড.: বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১), বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-ঢাকা; তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি-২০১৮খ্রি.।

Mahrnud Najrn Al-Arniri, Said: The Birth of Al-Wahabi Movment & it's Historic Roots. General Military Intelligence Directorate, Republic of Iraq (2002).

সম্পাদনা পরিষদ: ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা; দ্বিতীয় সংস্করণ: আষাঢ়-১৪১৩/জুন-২০০৬/জুমাদল আউয়াল-১৪২৭, ISBN: 984-06-1087-3।

ওয়াজ- কবিতা-প্রবন্ধ-পত্রিকা:

জালাল উদ্দীন রুমী, মুল্লা (১২০৭খ্রি.-১২৭৩খ্রি.): মাছনাভী-এ মৌলভী-এ মা‘নভী (মাছনাভী শরীফ), হামীদ এন্ড কোম্পানি, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; তারিখ বিহীন।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): মাওয়াইয-ই নাঈমীয়্যাহ, নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর- পাকিস্তান; জুন-২০০৬ খ্রি.।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): মু‘আল্লিম তাক্বরীর, ফারুক্বীয়্যাহ বুক ডিপো, মেটিয়া মহল, জা‘মে মসজিদ মার্কেট, দিল্লী-ভারত; মে-২০১০ খ্রি.।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মুফতী (১৩১৪হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.): দীওয়ান-এ সালিক, নাঈমী কুতুবখানা, উর্দূবাজার, লাহোর-পাকিস্তান; তারিখ বিহীন।

আসীফ ইকবাল মাদনী, মুহাম্মদ: তাফসীর-এ নাঈমী কে তা‘আল্লুক সে এক উলজান কা জাওয়াব’ (প্রবন্ধ) মাসিক তাহাফফুজ (উর্দূ পত্রিকা) করাচী-পকিস্তান; ফেব্রুয়ারি-২০১৫খ্রি.।

সফদর আলী কাদিরী, ড.: তা‘রুফ-এ কিতাব শান-এ হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল কুরআন (উর্দূ প্রবন্ধ), সূত্র: https://www.nafseislam.com/articles/taruf-kitab-shane-habib-ur-rehman

শারফুদ্দিন, হাসান মুহাম্মদ: হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (প্রবন্ধ-রাহমাতুল্লিল আলামীন-বার্ষিক প্রকাশনা), কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদরাসা, মোহাম্মদপুর-ঢাকা; ২০১৪খ্রি.।

আলতাফ হোসেন, মুহাম্মদ হৃদয় খান: ইসলামের দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা এবং সাহিত্যচর্চা (কলাম) দৈনিক ইনকিলাব; শুক্রবার, ০৭ অক্টোবর-২০১৬, সংখ্যা-১১৮।

ওয়েব লিংক:

https://bn.wikipedia.org/wiki/ https://ur.wikipedia.org/wiki/

https://en.wikipedia.org/wiki/

http://bn.banglapedia.org/

https://mawdoo3.com/

https://web.facebook.com/133053647537579/posts/152928535550090/?_rdc=1&_rdr.